কুমিরের হাঁ

না, এখন আর আমার নিজের সেই সত্যিকারের নামটায় কেউ ডাকে না। জানেও না অনেকে। যারা জানত তারাও ভুলে গেছে।

তাদের স্মৃতিশক্তির প্রতি অভিযোগ করে লাভ নেই, আমি নিজেই তো প্রায় ভুলতে বসেছি। আমি আমার ছদ্মনামের খোলসের কাছে আমার সত্তাকে সমর্পণ করেছি। ওই খোলসটা আশ্চর্যরকম সেঁটে বসে গেছে সেই সত্তার উপর, ওকে আর ওর থেকে পৃথক করে বার করে আনা যাবে এমন মনে হয় না।

অথচ দীর্ঘকাল ধরে ভেবে এসেছি বার করে আনাটা আমার ইচ্ছাধীন। যখন প্রয়োজন ফুরোবে, তখন ওই খোলসটাকে ভেঙে ফেলে বার করে আনব আমার আমিটাকে। এখন প্রয়োজন রয়েছে, এখন আমাকে ছদ্মবেশের আড়ালে আত্মগোপন করে থাকতে হবে।

এই ছদ্মবেশ যেদিন ভেঙে ফেলব, সেদিন প্রকাশিত হব, বিকশিত হব, উদ্দাম হব, প্রমত্ত হব। সেদিন হাততালি দিয়ে বলে উঠব সবাইকে, 'দেখ, এতদিন কেমন ঠকিয়ে এসেছি তোমাদের। তোমাদের হাত থেকে নিস্তার পেতে কেমন ছল করেছি।'

সেই অনাগত দিন-রাত্রিকে চিন্তা করতে করতে আমার এই ব্রহ্মচর্যে শীর্ণ দেহটার মধ্যেকার প্রবাহিত রক্তস্রোতে ঘুঙুর বেজেছে দ্রুত ছন্দে। গভীর রাত্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অস্থির পদচারণায় জেগে কাটিয়েছি।

জেগে কাটিয়ে আর একজনের চোখে নিজেকে দেখে থরথরিয়ে কেঁপেছি, দেহটাকে নিয়ে জর্জরিত হয়েছি, তার খাদ্য যোগাতে না-পেরে দিশেহারা হয়ে মাঝরাত্রে স্নানের ঘরে গিয়ে শাওয়ার খুলে মাথা পেতেছি।

চুলে-ভরা মাথাটা ভিজিয়ে ভিজিয়ে জলের সেই ধারাবর্ষণ গড়িয়ে পড়ছে আমার অনাবৃত বুকে পিঠে, গড়িয়ে পড়েছে আরও নীচে পা বেয়ে অনেক—অনেকক্ষণ ধরে। আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে রক্ত, থেমে গেছে ঘুঙুরের ঝমঝমানি। ঘরে এসে শুকনো তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছে, ভিজে চুল বালিশে ছড়িয়ে সাধনা করেছি উধাও হয়ে যাওয়া ঘুমকে ফিরিয়ে আনবার।

আমার এই ছোট্ট ঘরখানার অপর কোনো অংশীদার নেই, তাই আমার এই নৈশচারণের সাক্ষী থাকে না। যদিও জানি আমার মায়ের মনটা ভেঙে গিয়েছিল আমি হঠাৎ তাঁর শয্যাংশ ছাড়তে চাওয়ায়। করুণ করুণ মুখে বারবার বলেছিলেন তিনি, 'শুধু রাতটুকু শুবি বৈ তো নয়, ভোরবেলা উঠে নিজের কাজ করিস না বাপু!'

কিন্তু মা-র সে অনুরোধ আমি রাখিনি।

আমার যে মমতা হয়নি তা নয়, আমি মায়ের কোলের মেয়ে, জন্মাবধি বাইশ বছর বয়েস পর্যন্ত মায়ের কাছেই শুয়েছি, নতুন কোনো ভাগীদার এসে আমাকে স্থানচ্যুত করেনি, তাই বোধ হয় বড়ো বেশি শূন্যতা বোধ হয়েছিল মা-র।

কিন্তু কি করা যাবে?

বিয়ে হয়ে বরের ঘরে চলে যেতে পারতাম তো এতদিনে! তখন মা-র সেই শূন্য শয্যা পূর্ণ করতে কে আসত? এই ভেবেই মনকে শক্ত করে নিয়েছিলাম আমি।

বাবা বেঁচে থাকতে মা আর আমি বড়ো একটা চৌকিতে শুতাম, বাবা তাঁর সেই বিয়ের সময়কার ফুল-পাখিদার পালঙ্কে। বাবা মারা যাবার পর মা পালঙ্কটাকে খুব মূল্যবান বলেই দাদার ঘরে নিইয়ে দিলেন। তখন দাদার বিয়ের কথা চলছিল, শুধু বাবা মারা যাওয়ার জন্যে পিছিয়ে গিয়েছিল কিছুটা।

মা বলেছিলেন, 'এই খাটে আমার ফুলশয্যে হয়েছিল, আমার খোকারও হবে।' কিন্তু মা-র সেই সাধ পূর্ণ হয়নি, দাদার শ্বশুরবাড়ি থেকে সাদা পালিশের জোড়াখাট পেল দাদা, বাবার খাট ঠেলামারা হয়ে পুরনো ঘরে ফিরে এল।

মা নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'খোকা তো নিল না, যখন আমার ছোটোজামাই আসবে, এই খাটে বিছানা করে দেব।' হেসে বলতাম 'ছোটোজামাইয়ের স্বপ্নটা একটু কম করে দেখ মা, স্বপ্নটা দুঃস্বপ্নে পরিণত হতে পারে।'

মা রেগে উঠে বলতেন, 'কেন? কী ভেবেছ তুমি? বিয়ে করবে না?'

'করব না এমন প্রতিজ্ঞা করছি না', হেসে বলে উঠতাম, 'তবে তোমার জীবদ্দশায় নাও হতে পারে।'

মা বলতেন, ক্রুদ্ধ আর গম্ভীর গলায়, 'তা বেশ। তাহলে খোকাকে বলে যাব, যেন এই খাটখানাতে চাপিয়েই শ্মশানে নিয়ে যায় আমায়।'

আমি মায়ের রাগ দেখে হেসে ফেলতাম। বলতাম, 'তাহলে তো তোমার ছেলের কাঁধে চড়া হবে না মা, গোটা বারো অন্তত মুটে ডাকতে হবে।'

বাস্তবিক সেকেলে সেই ফুল-লতা-পক্ষীদার আর গুমো গুমো পায়া দেওয়া ওই পালঙ্কটা একেবারে রাক্ষুসে ভারী। কিন্তু পালঙ্কটা আমরা না-পছন্দ বলেই তো মা-র ঘর ছাড়িনি সত্যি, আসলে আমার দেহ-মন নির্জন রাত্রির স্বাদের আশায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। মা যখন শুতে এসে তাঁর ঘামে-ভেজা আর স্নেহে-ভেজা হাতটা আমার গায়ের উপর রাখতেন, স্বীকার করতে লজ্জা হলেও স্বীকার করব, মনটা কেমন একটা বিরস স্বাদে বিতৃষ্ণ হয়ে উঠত। অথচ জানতাম মা-র মনের মধ্যে একটু প্রত্যাশার প্রতীক্ষা। জানতাম, মা অনেকক্ষণ পর্যন্ত আশা করতেন আমিও তাঁর গায়ের উপর একটি হাত রাখি।

সেই বিনিময়ের সূত্রে মা একটু সাহস সঞ্চয় করতে পারেন, আমার সঙ্গে আর একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে সরে আসতে পারেন, ফিসফিসিয়ে দু'টো সুখ-দুঃখের কথা কইতে পারেন।

সুখের নয়, দুঃখেরই।

বউদি আসার পর থেকে মা-র যে চিরদিনের অপ্রতিহত কর্তৃত্ব-গৌরব ক্ষুণ্ণ হচ্ছে সে দুঃখকে মা বহন করছেন বটে, কিন্তু কিছুতেই যেন পরিপাক করে নিতে পারছেন না। অপরিপাকের সেই গ্লানি ব্যক্ত করে কিছুটা হাল্কা হতে চান মা। কিন্তু কেন জানি না, আমার সহানুভূতি আসে না, আমার ওই ফিসফিসিনি অসহ্য লাগে। মা-র ওই সহানুভূতি-প্রত্যাশী মনের বাহক হাতখানাকে ক্লেদাক্ত লাগে। যা অনিবার্য, যা চন্দ্র-সূর্যের নিয়মের মতোই অমোঘ, তার বিরুদ্ধে ওই প্যানপ্যানানিতে অরুচি আসে আমার, তাই মা-র সেই ভিজে ভিজে হাতখানাকে গা থেকে ঝেড়ে ফেলবার জন্যে কৌশলে ঘুমের ভান করে পাশ ফিরি।

বুঝতে পারি মা ক্ষুণ্ণ হন, গভীরভাবে একটা নিশ্বাস ফেলেন, স্বগতোক্তি করেন, 'বাবাঃ, এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়লি? এই তো কথা বলছিলি।'

আমাকে জেগে ঘুমিয়ে কাঠ হয়ে পড়ে থাকতে হয়, নড়বার উপায় থাকে না।

কিন্তু ওসব তো বর্তমান নয়, অতীত।

এখন তো আমি বারান্দার পাশের ওই ছোট্ট ঘরটায় আস্তানা গেড়েছি। যে ঘরটায় আমার বাবা যত রাজ্যের পুরনো পত্রিকা জমিয়ে রাখতেন, জমিয়ে রাখতেন ফুটপাত থেকে কেনা পুরনো বই। পত্রিকাগুলোকেও বাবা 'বই' বলতেন, তাই একফালি ঘরটাকে বলতেন লাইব্রেরি।

আমরা হাসতাম বাবার ঘরের ওই নামের বাহার শুনে, কিন্তু এখন বুঝতে পারি ওই বলাটুকুর মধ্যে দিয়েই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মেটাতেন বাবা। হয়তো এমন কতজনের জীবনেই হয়, অন্যজনের কৌতুকহাসির কারণ হয়েও সাধ মেটায়। লোকে সেই দুধের সাধ ঘোলে মেটানো দেখে 'আহা' না বলে বলে, 'আহারে!'

কিন্তু সে যাক। বাবার লাইব্রেরির সেই অমূল্য গ্রন্থরাজী ভাঁড়ারঘরের তাকে, চিলেকোঠার ঘরে চালান করে দিয়ে আমি নিজের জায়গা করে নিলাম। খাট-পালঙ্ক নয়, মাটিতে সতরঞ্চি পেতে সামান্য বিছানার সম্বলে শোয়া শুরু করলাম। বললাম, 'একা না শুলে আমরা ধ্যান-ধারণার সুবিধে হচ্ছে না।'

'ধ্যান-ধারণাই' তো বলতে হবে, কারণ আমি তো তখন ছদ্মবেশের খোলসে ঢুকেছি। শঙ্কর মহারাজ আমার নামকরণ করেছেন 'দেবী মা'।

প্রথম দর্শনের দিন থেকেই আমার উপর তাঁর অহেতুক অগাধ কৃপা। যেচে বললেন, 'কাল আমি একে দীক্ষা দেব।'

শুনে তো মা-র মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেল। মা থতমত গলায় বললেন, 'ও এমনি বেড়াতে এসেছে বাবা, ওর এখনও বে-থা হয়নি—'

মহারাজ বললেন, 'সবাই কি সংসার করতে আসে? আপনার এই মেয়ে ভগবতীর অংশ। একে উচ্চমার্গের পথে এগিয়ে দেওয়া আপনার কর্তব্য। জননীই প্রকৃত হিতকারিণী!'

এই ছেঁদো ছেঁদো কথা শুনে মনে মনে ভারী হাসি পেয়েছিল, বুঝলাম এইভাবেই ওঁরা শিষ্য নম্বর পাঁচশো পঞ্চান্ন বা ন'শো নিরানব্বই করে থাকেন।

কিন্তু মা ওই ছেঁদো কথায় ভয় পেলেন, মা তাড়াতাড়ি বললেন, 'আচ্ছা বাবা, বাড়ি গিয়ে মেয়ের মন বুঝি—'

মা একরকম পালিয়েই এলেন আমাকে নিয়ে। বউদি বসে রইলেন তাঁর সদ্যবিধবা ছোটো-বোনকে নিয়ে। প্রকৃতপক্ষে তার জন্যেই আসা। নচেৎ দাদা-বউদি কোনো মঠে এসে কোনো বাবা মহারাজের সামনে জোড়হস্তে বসে আছেন, এ দৃশ্যের মতো অকল্পনীয় দৃশ্য আর কি ছিল?

কিন্তু আশ্চর্য, সেই সদ্যবিধবা তরুণীর বিষাদাচ্ছন্ন মুখের দিকে নাকি দৃষ্টিপাতও করেননি মহারাজ। বউদি যখন কাঁদো-কাঁদো গলায় তার অবস্থা জানিয়েছিল, তখন শুকনো দুটো উপদেশ-বাণী দিয়েছিলেন, 'অদৃষ্ট, নিয়তি, প্রাক্তন কর্মফল' ইত্যাদি শব্দ-সংবলিত।

কিন্তু আমাকে কেন?

পরে বাড়ি ফিরে ভেবে দেখেছি—আমার মুখে-চোখে অবিশ্বাসের যে কৌতুকচ্ছটা খেলা করছিল, ওঁর ওই অহেতুক কৃপা তার বিরুদ্ধেই চ্যালেঞ্জ।

অনমনীয়কে আয়ত্তে আনতে পারাই তো শক্তির পরীক্ষা। বিরুদ্ধবাদীকে স্বমতে আনতে পারার মধ্যেই তো আত্মচরিতার্থতা। আমি যে ওঁর কথাগুলোকে 'ছেঁদো' ভাবছি, এটা ধরে ফেলে উনি রণক্ষেত্রে অবতরণ করলেন তূণে তীর ভরে। তাই আমার মধ্যে উনি ভগবতীর অংশ আবিষ্কার করলেন।

সেটাও বুঝে ফেলে আরও কৌতুকবোধ করলাম আমি, কিন্তু মা প্রমাদ গনলেন। মা বাড়ি ফিরে এসে বললেন, 'তোর আর তোর ওই বউদির সঙ্গে মঠে-ফটে যাবার দরকার নেই।'

এটাও কৌতুককর।

বাস্তবিক পক্ষে আমাদের এই জীবনের কোন্ ঘটনাই বা কৌতুককর নয়। মঠটা বউদির আবিষ্কৃত বটে, কিন্তু মা-রই আকুলতা ছিল বেশি। বউদিরই বরং ইচ্ছা ছিল না তার নিজস্ব আবিষ্কৃত ভূমিতে তার 'প্রতিদ্বন্দ্বিনী'র প্রবেশাধিকার ঘটুক। কিন্তু সাধু-সন্ত দেব-দেবী তো কারও কেনা জিনিস নয়, কাজেই মাকে আর আমাকেও সঙ্গে নিতে হয়েছিল বউদি বেচারাকে।

তা তখন তাকে আমার বেচারাই মনে হয়েছিল। কারণ বউদি বেশ কয়েকবার বলেছিল, 'শানু লজ্জা পাবে।'

শানু অর্থাৎ শান্তি, বউদির সদ্যবিধবা বোন।

মা কিন্তু বউদির সে অনিচ্ছাকে উড়িয়ে দিলেন। বললেন, 'সেকি জয়ন্তী, আমরা কি শানুর পর? বেবির সঙ্গে এক বয়সী, কতদিনের ভাব ওদের!'

হ্যাঁ, তখনও আমার নাম ছিল বেবি।

শঙ্কর মহারাজ না শুনে হেসে বলেছিলেন, 'নামের একটি অক্ষর আমি বদলে দেব। ধ্বনিটা ঠিক থাকবে, ছন্দটাও। শুধু একটি অক্ষর—বেবির বদলে 'দেবী'। দেবী মা।'

শুনে তখনই বউদির মুখটা ভারী হয়ে উঠেছিল। তবে তাতে আমি দোষও দেখিনি। সেটাই স্বাভাবিক। ওর অবস্থাটা হয়েছিল যেন 'যে এল চষে, সে রইল বসে'।

বউদিকে ব্যাজার করে আর আমাকে তোয়াজ করে তবে সেদিনকার অভিযান মা-র। হ্যাঁ, তোয়াজ করতে হয়েছিল। আমি রেগে রেগে বলেছিলাম, 'তোমরা যাচ্ছ যাও না, আবার আমাকে টানা কেন? ও সব আমার ভালো লাগে না।'

মা বললেন, 'একদিন গেলেই বা তোর কী এত লোকসান? শানু যাচ্ছে, তোর সময়বয়সী।'

জানি এটা মা-র একটা ট্রিক্। এই সেন্টিমেন্টে ঘা দিয়ে কথা বলা। শানু বিধবা হয়েছে, শানু দুঃখী, অতএব শানুকে করুণা করা তোমার কর্তব্য, তাকে সঙ্গ দেওয়া তোমার মানবিকতা বোধের পরিচায়ক। এই আর কি।

কিন্তু আসলে মা-র উদ্দেশ্য ছিল অন্য তা বুঝেছিলাম। মা সেই মহারাজের কাছে জানতে যেতে চেয়েছিলেন তাঁর মেয়েটির কবে বিয়ের ফুল ফুটবে। সে ফুল যে অনেকদিন আগেই ফুটিয়ে বসিয়ে রেখেছে তাঁর মেয়ে, সে কথাটি তো জানা ছিল না মা-র!

তাই ব্যাকুল হচ্ছিলেন।

আর উৎখাত করছিলেন দাদাকে।

তা শালী বিধবা হবার আগে পর্যন্ত দাদাও চেষ্টার ত্রুটি করেনি, উঠে পড়ে লেগে পাত্র যোগাড় করে এনে আমার সামনে ধরে দিয়েছে, আমার সঙ্গে মিশতে দিয়েছে, আমাকে তার সঙ্গে বেড়াতে যেতে দিয়েছে। কিন্তু দাদাকে 'সফল' হতে দিইনি আমি, যে কটাকে এনেছে, সব ক'টাকেই নাকচ করে দিয়েছি।

অবিশ্যি মা যতই মেয়ের বিয়ে বিয়ে করুন, এই ধরনটা মা-র পছন্দ হত না। সেই চিরাচরিত পদ্ধতিতে মেয়ের অষ্টাঙ্গে গহনা পরিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে আর জানলামুখো করে বসিয়ে কনে দেখনোটাই ছিল মা-র আদর্শ। তারপর তো দেনা-পাওনার প্রশ্ন আছেই। কন্যাপক্ষ যে দেনদার, এবং বরপক্ষ পাওনাদার, এটাকে নিতান্তই স্বাভাবিক রীতি বলে মনে মনে গ্রহণ করতেন, এবং এই ভাবটাই পোষণ করতেন—ওই সব স্বাভাবিক পদ্ধতির অভাবেই বিয়েটা ঘটছে না। আর এ সন্দেহও পোষণ করতেন—টাকাকড়ি খরচা হবার ভয়েই বউদি এই ফ্যাসানটির আমদানী করেছে।

হ্যাঁ, ফ্যাসানটি বউদিরই আমদানী।

বউদির সঙ্গে দাদার 'ভাবের' বিয়ে বলে, বউদি ঘটকে-ঘটানো বিয়েকে খুব নিম্নশ্রেণীর বলেই মনে করে।

কিন্তু এটাই বা কি?

মনে মনে একচোট হেসে নিতাম আমি।

তুমি দাদা, আমার হিতৈষী অভিভাবক, কুল-শীল মিলিয়ে কেরিয়ার বিবেচনা করে পাত্র ধরে এনে তার সঙ্গে বেড়াতে যেতে দিলে আমায়, অথবা দুখানা টিকিট কেটে হাতে গুঁজে দিয়ে সিনেমা হল-এ পাঠিয়ে দিলে, তার নাম পূর্বরাগ?

আমার তো এটাকে ক্যারিকেচার মনে হত।

বার কয়েক নাকচ করে, অথবা বলতে পারা যায়, নাকচ হয়ে হয়ে (অর্থাৎ আমার ব্যবহারে নাকচ করতে বাধ্য হত তারা) যখন দাদা বউদি এবং মাকে বিরক্তির সীমারেখায় এনে ফেলেছি, আর মা জোরগলায় ঘোষণা করেছেন 'এসব ফ্যাশানেপনায় বিয়ে হবে না—' তখন শানু আমায় উদ্ধার করল। বিধবা হয়ে এসে তার দিদির গলায় পড়ে ননদের বিয়ের থেকে অনেক বেশি গুরুতর সমস্যার জালে জড়িয়ে ফেলল বউদিকে।

মা নেই বউদির, তাই বোনকে কাছে টেনে না এনে পারল না। আমি দৃশ্যপট থেকে একটু সরে গেলাম।

তবে সরে গেলে মা-র চলবে কেন?

তাই মা বউদির সঙ্গ ধরে শঙ্কর মহারাজের কাছে ছুটেছিলেন মেয়ের বিয়ে সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী শুনতে।

কিন্তু এ কী বাণী শুনলেন?

সবাই কি সংসার করতে আসে? কিছু কিছু মানুষকে অধ্যাত্ম পথের পথিক হতে হয়।

মা ভয় খেয়ে বললেন, 'তোকে আর মঠে-ফটে যেতে হবে না।'

তিন

মা-র ওই নিষেধবাণীতে আর একবার কৌতুক বোধ করলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে মাথায় একটা দুষ্টুমি খেলে গেল। ভাবলাম এই তো বেশ একটা পথ পাওয়া যাচ্ছে—মার 'বিয়ে বিয়ে' উৎপীড়নের হাত থেকে রক্ষা পাবার। কিছুদিন অন্তত এই পথে খেলানো যায় মাকে।

আর মনের অগোচর পাপ নেই, বউদির উপর টেক্কা দেবার এই একটা সুযোগ পেয়েও বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলাম। বউদি গেল তার বোনকে নিয়ে আকুলতা পেশ করতে, আর বিজয়িনী হয়ে ফিরে এলাম আমি, হলাম 'দেবী মা', হলাম ভগবতীর অংশ, এটা অহমিকা পরিতৃপ্তির একটা সুখ এনে দিল বৈকি।

তাই আমি অবহেলাভরে বললাম, 'কেন? যেতে ভয় কি? শঙ্কর মহারাজ কি আমাকে স্বর্গের পথে চালান করে দেবেন?'

মা বললেন, 'থাক বাবু, ঠাট্টা-তামাসা। ওদিকে আর নয়। সাধু-সন্নিসীরা বড়ো সর্বনেশে জিনিস। ওঁদের দিকে না-মাড়ানোই ভালো।'

হেসে ফেললাম।

বললাম, 'মা, এই ঘণ্টাকতক আগে তুমি আমায় গঞ্জনা দিয়েছ, 'ওদিক' মাড়াতে রাজী হচ্ছিলাম না বলে।'

'সে আলাদা', মা-র গলায় অসন্তোষ, 'সে এমনি একবার দর্শন করতে যাওয়ার কথা বলেছি।'

'আমি তো ভাবছি কাল গিয়ে দীক্ষাটা নিয়ে নেব।'

'বকিসনে, থাম।'

'বকিসনে কি মা? অত লোকের মধ্যে থেকে তোমাদের মহারাজ আমাকেই সিলেক্ট করে বসলেন, এটা কি কম মজার? আমি কাল যাচ্ছি—'

'কুমতলব ছাড় বেবি, আমাকে জ্বালাতন করতে ওসব গোলমেলে কাণ্ড করতে বসিসনে। কে জানে বাবা ওঁরা সব অন্তর্যামী কিনা, ঠাট্টা-তামাসা না-করাই ভালো।'

'বেশ তো, অন্তর্যামী কিনা তার পরীক্ষাটা হয়েই যাক।'

'আগুন নিয়ে খেলতে চেষ্টা করিসনে বেবি!'

হেসে উঠলাম।

বললাম, 'তুমি ভাবছ আগুন, আমি তো ভাবছি স্রেফ ফুলঝুরি।'

তারপর বউদি এল, থমথমে মুখ, শানুকে নিয়ে ঝপ করে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। তাই যায় অবশ্য। শানুকে নিয়ে বেড়াতে যায় সর্বত্র, দোকানে, সিনেমায়, অনাত্মীয় বন্ধুর বাড়িতে, আর বুঝতে আটকায় না বেশ সহজভাবেই যায়, কিন্তু বাড়ি ফিরলেই দুই বোনেই মুখটা বিষণ্ণ করে ফেলে। আত্মীয়-বাড়িতে যায় না ওই জন্যে।

অবশ্য শানু এটা করতেই পারে। জানি, শোকের থেকে লজ্জটাই বড়ো হয়ে ওঠে এ বয়সে। ও যে স্বামী মরে যাওয়া সত্ত্বেও হাসছে, গল্প করছে, সিনেমা দেখছে, এটা স্বচ্ছন্দে করতে লজ্জা করত ওর।

অথচ ওর যা বয়েস, তাতে শোক নিয়ে ঘরের কোণে পড়ে থাকা সম্ভব নয়। তাছাড়া ক'দিনই বা বিয়ে হয়েছিল ওর? কতইবা ভালোবাসা পড়েছিল বরের উপর?

বউদি বলত, 'ওর মনটা অন্যমনস্ক রাখতে নিয়ে নিয়ে বেরোই।' দাদাও সেই সমীহতে তটস্থ থাকে, আর শানু মুখের উপর একটা বিষণ্ণতার প্রলেপ মেখে মনকে অন্যমনস্ক রাখবার সাধনা করে চলে।

আমি বুঝতে পেরেছিলাম ওই 'মহারাজ' আবিষ্কার করাও বউদির আর এক চাল। যেন অন্ধস্নেহ কেবলমাত্র অসার আমোদে নিমজ্জিত রাখছে না বিধবা ছোটোবোনকে, তার উন্নতির পথের সহায়তা করছে। খুঁজে খুঁজে বার করে ফেলেছে তার মুক্তির উপায়।

চার

প্রথম দিকে আমি একদিন বলে ফেলেছিলাম, 'অন্যমনস্ক রাখতে এত রকম উপায় আবিষ্কার না করে শানুর আর একবার বিয়ে দাও না বাবা! জীবনের কী-ই বা হয়েছে ওর!'

বউদি ভাবলেন, এটা বোধহয় ওঁর শোকে ভেঙে-না-পড়া বোনকে ব্যঙ্গ করা হল, তাই রুক্ষ গলায় বলে উঠলেন, 'কুমারী মেয়েরই একটা বর জোটে না এদেশে, তার আবার বিধবার।'

এই কুমারী কন্যাটার উল্লেখ অবশ্য আমার উপরই কটাক্ষপাত, তাই মৃদু হেসে চুপ করে গেলাম।

যাই হোক, সেদিন বউদি যখন সাধুর মঠ থেকে ফিরে এল, মুখটা আরও থমথমে। সিনেমা দেখে ফিরে আসার থেকেও অনেক বেশি। আর ঘরে ঢুকে আদৌ বেরোলই না।

খাবার জন্যে ডাকতে গিয়ে মা প্রায় অপমানিত হয়েই ফিরে এলেন।

মা ভয়ে ভয়ে বললেন, 'ওখানে কি প্রসাদ পেয়েছ?'

বউদি ঘর থেকে ছুঁড়ে মরালেন, 'অভাগারা প্রসাদ পায় না মা!'

এ প্রসাদ অবশ্যই অন্য অর্থবাহী।

মাকে ডেকে বললাম, 'ইচ্ছে করে অপমান হতে যাও কেন?'

'কি করে জানব বল? খেতে ডাকতে হবে তো? না-খেয়ে থাকবে?'

'একদিন না-খেলে মানুষ মরে না।'

'একদিন কেন, নিত্যই তো খায় না। বোনের জন্যে নিজের দেহটা পাত করছে।'

বড়ো করুণা হল মায়ের উপর।

ভাবলাম কী অবোধ, কী অবোধ!

কিন্তু এই অবোধের শান্তিটুকু নষ্ট করতে ইচ্ছে হল না। তা ছাড়া যদি মাকে বলে বসতাম অত ভয় করবার হেতু নেই মা, হোটেল-রেস্টুরেন্ট থেকে খাবার আসে, দুই বোনে তার সদ্ব্যবহার করে থাকেন, তাহলে মা জীবনে আর কোনোদিন শানুকে শ্রদ্ধার বা স্নেহের চক্ষে দেখতে পারতেন না। কারণ সেটা হত মা-র চিরায়ত সংস্কারের ওপর প্রকাণ্ড হাতুড়ির ঘা।

সেটা আমি চাই না।

শানুকে আমি ভালোবাসি। বয়সে আমার সমান-বয়সী হলেও, ওকে আমার অনেক বালিকা মনে হয়। ও অন্যের ইচ্ছের পুতুল হতে পারে। ওর স্বামী থাকলে সেই ইচ্ছের পুতুলটিকে নিয়ে সুখে সংসার করতে পারত। কিন্তু সেটা ভাগ্যে নেই লোকটার। তাই ফট্ করে মরেই গেল।

এখন তাই শানু তার দিদির ইচ্ছের পুতুল হয়ে কোনোদিন দক্ষিণেশ্বরে যাচ্ছে, কোনোদিন সিনেমা যাচ্ছে। কখনও আশ্রমে দীক্ষা নিতে ছুটেছে, কখনও লুকিয়ে হোটেলের চপ-কাটলেট খাচ্ছে।

জানি, বউদি এটা মমতার বশেই করে। ওই ছোট্ট বোনটাকে, যে নাকি মাছ-মাংস ব্যতীত এক গ্রাস খেতে পারত না, তাকে শাকপাতা খাইয়ে রাখতে প্রাণ ফেটে যেত তার, তাই এই লুকোচুরি। সে লুকোচুরিটাকে ঘৃণা করে করুণা করতাম আমি। আর বউদি ভাবত বুদ্ধির কৌশলে ও আমাদের চোখে ধুলো দিতে পারছে।

শানুকে ভালো না বাসলে হয়তো কোন্‌দিন বউদির এই গোপনতাকে ধিক্কার দিয়ে বসতাম, কিন্তু আগেই বলেছি, শানুকে আমি ভালোবাসি। দাদার বিয়ে হয়ে ইস্তক তো দেখছি। ভারী নিরীহ আর ভীতু ভীতু মেয়েটা। ঠিক তার দিদির বিপরীত!

কিন্তু সেদিন আমার হঠাৎ কেমন রোখ চেপে গেল, ওই মেয়েটার প্রতিপক্ষ হয়ে বসলাম।

অথবা ওই মেয়েটায়ও নয়, ওর দিদির। কিন্তু বহির্দৃশ্যে ওই মেয়েটারই প্রতিপক্ষ হলাম।

ওকে ডিঙিয়ে আমি শঙ্কর মহারাজের কৃপা অর্জন করে ফেলব।

আর আমি সংকল্প করলাম,—ওদের নাকের সামনেই দীক্ষা নিয়ে আসব। আর দেখিয়ে দেব কৃচ্ছ্রসাধন কাকে বলে।

এই একটা দিক। তাছাড়া, আরও একটা দিক আছে। আর সে কথা তো আগেই বলেছি। এই সুযোগে একটা ছদ্মবেশ নিয়ে আমি আমার মা-র হাত থেকে রক্ষা করব আমাকে।

তাই পরদিন মা-র শত আপত্তি এড়িয়ে সেই শঙ্কর মহারাজের মঠে গিয়ে হাজির হলাম, দীক্ষা নিয়ে এলাম।

প্রাণ ধরে আমায় একা ছাড়তে পারেননি মা, সঙ্গে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমি মা-র তোয়াক্কা রাখিনি। সোজা মহারাজের সামনে গিয়ে বলেছিলাম, 'দীক্ষা নিতে কি কি লাগবে বলুন।'

আমার এই প্রায়-দুর্বিনীত উক্তিতে মহারাজের চেলা-চামুণ্ডারা বোধকরি চমকে উঠেছিল, কিন্তু মহারাজের চক্ষে বরাভয়।

কিন্তু শুধুই কি বরাভয়?

কেমন একটা পুলক-চাঞ্চল্যেরও আভাস ছিল না কি? কিসের সেই পুলক? বিজয়-গৌরবের? বোধহয় তাই। বোধহয় ভেবে আত্মপ্রসাদ অনুভব করছিলেন আমি তাঁর মহিমায় অভিভূত হয়ে ছুটে গিয়েছি। অতএব পরীক্ষা হয়ে গেল, অন্তর্যামী নয়।

পাঁচ

সেই শুরু।

মা আমার সঙ্গে ফিরলেন চোখের জল মুছতে মুছতে।

আমি জোরে জোরে হেসে বললাম, 'কী হল? কান্নার কী হল?'

মা ডুকরে উঠলেন, 'কোথায় তুই বিয়ে হয়ে বরের সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি যাবি, তা নয় সন্নিসীর কাছে দীক্ষা নিয়ে এলি!'

'বাঃ, তাতে খারাপটা কি?'

'খারাপ নয়?'

'আমি তো কিছু খারাপ দেখছি না। কোনো বন্ডে তো সই করিনি যে, জীবনে কখনও সংসার করব না, অর্থাৎ বিয়ে করব না।'

'সই করার বাকিই বা কি? বললেন তো, আমিষ খাদ্য খাওয়া চলবে না, নিত্য হাজার জপ করতে হবে—'

'জপ করতে হবে না তো—' আমি হেসে উঠে বললাম, 'জপের খাতা তৈরি করে তাতে হাজার বার ইষ্টনাম লিখতে হবে।'

'সে একই।'

'উহুঁ, এক নয়। চোখ বুজে জপ করার থেকে অনেক সহজ। বললেন শুনলে না, কলিতে সাধনার পদ্ধতি সহজ।'

'কিন্তু এই বয়সে এসব তুই করতে যাবি কেন?'

আমি মা-র জ্বালা দেখে খুব আমোদ পেলাম। আর কারও জ্বালাতে সেইমাত্র শুনে আসা পরমার্থিক বাক্যি কিছু বর্ষণ করে ফেললাম, 'সাধনার কি বয়েস আছে মা? বয়েস তো এই দেহটার, আত্মার বয়েস তুমি জান? জান কি কত কোটি কোটি বছর তার আসা-যাওয়া চলছে?'

মুখস্থ করার বিদ্যেটা চিরদিনই আমার প্রবল। বাবা আমার এ বিদ্যেটায় ভারী খুশি ছিলেন। বলতেন, 'আমার আর তিনটে ছেলেমেয়ে রাবিশ। একটা লাইন মুখস্থ রাখতে পারে না। আজ শিখলে কাল ভোলে। বেবিই শুধু—'

আসল কথা 'মুখস্থ' শব্দটা ভুল। বলা উচিত, 'অন্তরস্থ'। অন্তরস্থ করতে না পারলে মুখস্থ থাকে না।

তা যে শব্দের যে অর্থই হোক, বাবা আমায় রাশি রাশি কবিতা মুখস্থ করাতেন, এবং সন্ধেবেলায় বসে বসে সেই সব আবৃত্তি শুনতেন। শুনতেন আর বাহবা দিতেন। বলতেন, 'আশ্চয্যি, কমা-সেমিকোলনটি পর্যন্ত এদিক-ওদিক হয় না।'

তাই গুরু-উপদেশবাণীও আমার একবার শুনেই নিখুঁত মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল।

মা কিন্তু ভয়ঙ্করভাবে ভয় পেয়ে গেলেন। মা ভাবলেন সত্যিই বুঝি মা-র এই আদুরে মেয়েটার উপর ভগবতীর ভর হল। সংসারী মানুষের ভূত আর ভগবান দুইয়ের উপরই সমান ভয়। তাই মুখে যতই বলুক ভগবানে ভক্তি হোক, সত্যি ভক্তির পরিচয় পেলে আতঙ্কিত হয়। ভাবে ওই বুঝি ছাড়ল সংসার।

মা-র এই আতঙ্কে আরও কৌতুক লাগল, বললাম, 'হয়তো পূর্বজন্মে আমি একটু কাজ এগিয়ে রেখেছিলাম, তাই এ জন্মে চট করে হয়ে গেল যোগাযোগ। নইলে শানুকে তো—'

ছয়

না, শানুকে দীক্ষা দেননি শঙ্কর মহারাজ। বলেছিলেন, 'এর এখনও সময় আসেনি।'

বউদি ক'দিন ঘোরাঘুরি করল, তারপর আশ্রমে আমার আদর আর আধিপত্য দেখে বিতৃষ্ণ হয়ে ছেড়ে দিল। রাগ করে বোনকে তার ক'মাসের শ্বশুরবাড়িতে পাঠিয়ে দিল। ক্রমশ ক্লান্তও হয়ে উঠেছিল বোঝা যাচ্ছিল। রাত্রে স্বামীসান্নিধ্য ত্যাগ করে বোনকে নিয়ে পড়ে থাকা, কতদিন চলতে পারে?

এ একটা ছুতো হল।

মাকে আর আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, 'মহারাজ ওভাবে ফিরিয়ে দেওয়ায় বড্ড মন-ভাঙা হয়ে পড়েছ, যাক, দু'দিন ঘুরে আসুক।'

আমি সেদিন আর-একবার ওর বিয়ের কথাটা তুললাম। দাদার উপস্থিতিতে। বললাম, 'ভাঙা মন জোড়া লাগাতে ওকে নিয়ে যা-তা না করে আর একবার বিয়েরই চেষ্টা কর না বাপু!'

দাদা ভুরু কুঁচকে বলল, 'তার মানে?'

'মানে তো কিছু শক্ত নয় দাদা! বেচারা তো বলতে গেলে কুমারীই। নিজের বোনের জন্যে তো পাত্র খুঁজছিলে, সেই খাটুনিটা না হয়ে বউয়ের বোনের জন্য খাটলে।'

'থাক, তোমাকে আর উপদেশ দিতে হবে না', ঝেঁজে উঠল বউদি, 'তুমি ঊর্ধ্বলোকের জীব, এসব তুচ্ছ চিন্তায় না-থাকাই ভালো।'

তখন বলেছিল।

তখন ওরা অভিভূত হয়নি।

দাদা বলেছিল, 'নিজের বোনের জন্যে খোঁজাটা ছেড়েই দিতে হবে তাহলে?'

'নিশ্চয়।'

'দেবী মা হয়েই থাকবে ঠিক করেছ?'

'দেখা যাক না।' বলে হাসলাম মনে মনে। মনে ভাবলাম, আমার দিন আসুক, আসুক দুরন্ত অমিতাভ আফ্রিকার অরণ্য থেকে সোনার তাল কুড়িয়ে নিয়ে। তখন জানাব কেন তোমায় মুক্তি দিচ্ছি বোনের বর খোঁজার দায় থেকে।

সাত

হ্যাঁ, দুরন্তই ওর আসল নাম, ডাক-নাম। অমিতাভটা পোশাকী নাম। বলতাম, 'পোশাকী নামটা তোমার সম্পর্কে স্রেফ অচল। এই এইটেই হচ্ছে ঠিক। দুরন্ত!'

ও বলত, 'ঠিক তো? তাহলে আমার দোষ নেই, নামের উপযুক্ত কাজই করছি।'

আমি ছিটকে সরে আসতাম, বলতাম, 'রক্ষে কর, ক্ষ্যামা দাও। শ্রীযুক্ত অমিতাভবাবুই হও।'

'নাঃ। দু'বার দু'রকম নির্দেশ চলবে না।'

বলতাম, 'তাহলে আমারও থাকা চলবে না।' বলতাম, তবু বসে থাকতাম। কে যেন পেরেক দিয়ে পুঁতে রাখত আমায় সে-ঘরের মাটির সঙ্গে। যদিও সেই ঘরটায় দুরন্তর কোনো অধিকার ছিল না। দুরন্ত হচ্ছে রমেশবাবুদের আশ্রিত। যে রমেশবাবুর কাছে আমি পড়তে যেতাম। রমেশবাবু আমাদের স্কুলের ইংলিশের টিচার।

এমন কিছু বড়োলোক নয় রমেশবাবু, তবু একটা ছেলেকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছিলেন, তার লেখাপড়ার ভার নিয়েছিলেন। বিনা স্বার্থেই নিয়েছিলেন।

কিন্তু রমেশবাবুর গিন্নি এটা বরদাস্ত করতে পারতেন না। তিনির মনোভাব—'বেশ, আছে থাক, কিন্তু কিছুটা উসুল হোক।'

সেই উসুলটা করতেন তিনি চাকর তুলে দিয়ে।

ঝি না এলে বাসনও ধুইয়েছেন দুরন্তকে দিয়ে। নিজের অসুখ করলে ভাতও রাঁধিয়েছেন।

আমি রেগে যেতাম, বলতাম, 'এসব তুমি সহ্য কর কি করে?'

ও হেসে বলত, 'কী হয়েছে? গ্রামের বাড়িতে মায়ের অসুখ করলে তো কতদিন রান্না করেছি, কাপড় কেচেছি, বাসনও মেজেছি।'

'সেটা আর এটা এক নয়।'

'এক ভাবলেই এক।'

এই বলিষ্ঠতা ছিল ওর চরিত্রে।

আশ্রিতের কর্তব্যবোধ ছিল, আশ্রিতের ক্ষোভ-অভিযোগ ছিল না। ছিল না চিত্তদৈন্য, ছিল না অভিমান বা অপমান জ্ঞান। যেন নিজের বাড়িতেই আছে। ও যেমন স্বচ্ছন্দে স্নানের ঘর থেকে হাঁক পাড়তে পারত, 'কাকিমা, শীগগির! শীগগির! ভাতটা রেডি করে ফেলুন।' তেমনি স্বচ্ছন্দেই বলতে পারত, 'ঠ্যাংটা বাড়ান তো একটু, মালিশটা করে দিয়ে যাই। নিজে তো আর করবেন না। মালিশের ওষুধ টেবিলে পড়ে থাকলেই কি বাত সারবে?'

এই সহজ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ ছিল বলেই বোধহয় ও প্রথম দিনেই আমায় 'তুমি' বলেছিল।

ও তখন রমেশবাবুর জুতোটা নিয়ে পালিশ করছিল, বলল, 'কাকাকে খুঁজছ, কাকা তো বাড়ি নেই। বসতে চাও তো বসবার ঘরে বস।'

আমি জানতাম না যে, রমেশবাবুর বাড়িতে এমন কোনো ছেলে আছে। ভাবলাম চাকর। আর ভাবলাম এতই গাঁইয়া যে, 'তুমি আপনি'র ভেদ জানে না। কিন্তু দেখলে কে বলবে চাকর!

সেদিন চলে এলাম।

পরদিন আর একটু দেরিতে গেছি, দেখি দিব্যি ফর্সা কাপড়-জামা পরে বেরোচ্ছে, হাতে বইয়ের গোছা। বললাম, 'স্যার বাড়ি আছেন?'

'আছেন।'

'বই নিয়ে যাচ্ছ কোথায়?'

'কলেজে, আর কোথায়?'

'কলেজে? তুমি কি কলেজে পড় নাকি?'

'তা নইলে গ্রাম থেকে এলাম কি করতে?'

'তুমি' বলা হয়ে গেছে আর 'আপনি' চলে না, তাই বললাম, 'মাস্টারমশাইয়ের কোনো আত্মীয় হও বুঝি?'

'আত্মীয়?' ও হাসল।

বলল, 'আমি ওঁর আত্মীয় হই না, তবে উনি আমার আত্মীয়।'

চাকর যে নয়, তা বুঝে ফেলেছিলাম। আর ওর ওই ভয়ঙ্কর উজ্জ্বল চোখ দুটো যেন আমাকে তীব্রভাবে সম্মোহিত করছিল।

তাই কথার পিঠে কথা বাড়ালাম, 'তুমি ওঁর আত্মীয় নয়, উনি তোমার আত্মীয়? সেটা আবার কি রকম?'

'বুদ্ধি থাকলে বুঝতে।'

রাগে আপাদমস্তক জ্বলে গেল।

বললাম, 'বুদ্ধি না থাকতে পারে, তবে কথার একটা মানে থাকা দরকার।'

'মানেটা বুঝতে না-পারাই তো আশ্চয্যি। থাক, আর মানে বুঝতে হবে না। দেরি হয়ে যাচ্ছে আমার।'

'দেরি! ইস! কলেজে পড়ে না হাতি! বই নিয়ে কাউকে দিতে যাওয়া হচ্ছে।'

'তা হলে তাই।'

বলে হেসে চলে গেল ও।

ও যদি সতেজে প্রতিবাদ করত, তাহলে আমার অভিমানবোধ এমন ক্ষুণ্ণ হত না। আর সেই সূত্রে আরও কথা চালাতে পারতাম। অবচেতন মনে যা চাইছিলাম। কিন্তু ও অবজ্ঞা করে চলে গেল।

তখন হায়ার-সেকেন্ডারির জন্য টেস্টে অ্যালাউ হয়েছি, স্যার বলছেন খুব নাকি ভালো পড়ছি আমি, তাই মনের মধ্যে বিরাট আত্মমর্যাদাবোধ, তাই এই অবজ্ঞাটা প্রাণে লাগল। ভাবলাম, রোসো শোধ নিচ্ছি!

আট

সেই প্রথম পরিচয়।

শোধ নেবার সংকল্পে দৃঢ় হলাম।

তারপর জানলাম ও রমেশবাবুর বাল্যবন্ধুর ভাইপো, দীনহীন আশ্রিত। জানলাম ওর নাম 'দুরন্ত'। জানলাম আশুতোষে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে। জানলাম যেমনি সপ্রতিভ, তেমনি জলি।

তারপর জানলাম ওকে ভালোবেসে ফেলেছি।

ও বলত—মানে পরে, যখন আমি মাকে নানা মিথ্যা কথায় ছলনা করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে ওর সঙ্গে লুকিয়ে বেড়াতে পালিয়ে যাচ্ছি।

কলেজে ভর্তি হয়েছি তখন, সুবিধে কিছু সঞ্চয় হয়েছে। কোনোদিন বলি বান্ধবীর বাড়িতে পড়তে যাচ্ছি, কোনোদিন বলি লাইব্রেরি যাচ্ছি। কোনোদিন হয়তো—অর্থাৎ এরকম ক্ষেত্রে অন্য যে-কোনো মেয়েই যা যা বলত, যেভাবে ছলনা করত, ঠিক তাই করতাম। নতুন কিছু না।

ছলনা করে বেরিয়ে পড়ে আবার ওর সঙ্গে ছলনা করতাম। বলতাম, 'আর এরকম চলবে না। মা জেনে ফেলেছেন।'

তখন বাবা মারা গেছেন, শুধু 'মা'। মা-র কথাই বলতাম।

ও বলত, 'লুকোচুরির কি আছে? বললেই পার স্পষ্ট করে।'

'আহা রে! কী বলব শুনি?'

'কেন? বলবে, 'মা, মাস্টারমশাইয়ের বাড়ির জুতো-ঝাড়া চাকর সেই দুরন্তটার প্রেমে পড়ে গেছি আমি। তাই তাকে নিত্য একবার না-দেখলে ছটফটিয়ে মরি।'

রেগে বলতাম, 'আমি তোমায় বলেছি কোনোদিন জুতো-ঝাড়া চাকর?'

'বলনি, ভেবেছ।'

'আহা একেবারে অন্তর্যামী! কে কি ভেবেছে—'

'অন্তর্যামীই তো।' হেসে উঠত ও, 'না হলে সেই প্রথম দিনেই কী করে বুঝলাম, মেয়েটা স্কুলের বালিকা হলে কি হয়, রীতিমতো পরিপক্ক। একটা ছেলেকে দেখল আর প্রেমে পড়ল! একেবারে অগ্নিতে পতঙ্গবৎ।'

'ইস্, অহমিকার আর শেষ নেই! দেখল আর প্রেমে পড়ল!'

'পড়নি তো এত ছটফটানি কিসের?'

'ছটফটানি আবার কি?'

'ও', নেই বুঝি? আচ্ছা, ঠিক আছে, কাল থেকে আর আসবার দরকার নেই।'

'বেশ।'

ও হঠাৎ দুরন্ত বেগে এক সেকেন্ডের মধ্যে আমার চোখের কাজল, ঠোঁটের রং, খোঁপার বাঁধুনী, সব লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে বলত, 'এই খবরদার! অ্যাবসেন্ট হলে চলবে না। আমার দরকার আছে।'

রেগে যেতাম, হাঁপিয়ে যেতাম, বলতাম, 'কে তোমার নামটা রেখেছিল?'

'কি জানি। নিশ্চয়ই কোনো দূরদ্রষ্টা ঋষি।'

'কক্ষণো আসব না আর।'

'পাগল! কালই আসবে আবার আরও সেজে-গুজে।'

'এইভাবে ঘোচাতে?'

ও একটা হতাশ নিশ্বাস ফেলে বলত, 'এ আর কিই বা!' ওর সেই চোখদুটোয় যেন আগুন জ্বলে উঠত।

আমার বুকটা কেঁপে উঠত।

পালিয়ে আসতাম।

ভাবতাম, নাঃ, সত্যিই আর নয়।

কিন্তু ক'দিন থাকত সে প্রতিজ্ঞা?

নয়

ছেলেমানুষী মজা থেকে ক্রমশ জ্বলে ওঠে বাসনার আগুন, তীব্র থেকে তীব্রতর হয় আকর্ষণ। রাতে মা-র শয্যার একাংশে শুয়ে শুধু সেই পরম রমণীয় ক্ষণটুকুরই চিন্তা করি, যে ক্ষণটুকু অনেক চেষ্টায় আহরণ করি। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আস্বাদ করি ওর কথা, ওর হাসি, ওর দুরন্ত আবেগ।

কোনো কোনোদিন মনে হয় কাল আর বাড়ি ফিরব না, বলব, চল আমরা কোথাও পালিয়ে যাই।

কিন্তু দিনের আলোয় সে চিন্তার অবাস্তবতা ধরা পড়ে। ও তখনও পরাশ্রিত পড়ুয়া ছেলে, আর আমি মা-দাদার পরম বিশ্বাসস্থল একটা থার্ড ইয়ারের ছাত্রী মাত্র। পালিয়ে গিয়ে কি গাছতলায় সংসার পাতব?

বলতাম, 'এম.এ. পড়ে তোমার কী ডানা গজাবে? এটা কিছু কর না?'

'করছি তো—'

'কী করছ?'

'কেন, প্রেম।'

'থামো অসভ্য! রোজগারপাতির চেষ্টা কর না?'

'তা সেটাই তো করছি। এম.এ. দিয়ে বেরোতে আর একটা বছর, তারপর দু'টো বছর যাবে রিসার্চে। একটা ডক্টরেট নিয়ে—'

'প্রফেসরি করবে, এই তো?'

'সেটাই আমার আপাতত লক্ষ্য। আমার বাবা শিক্ষকতা করতেন, আমিও তাই করব। মা-র তাই ইচ্ছে ছিল।'

'ঠিক আছে। মাস্টারিও শিক্ষকতা। যা তোমার বাবা করতেন। আমিও বি.এ. দিয়ে বেরোলেই—'

'নাঃ। স্কুলমাস্টারি নয়।'

'তা তো বটেই।' আমি রেগে বলতাম, 'তাতে সুবিধে কি? কলেজের অধ্যাপনা, দোহাত্তা ছাত্রীদের সঙ্গে প্রেম, তবেই তো সুখ।'

'কী সর্বনাশ! দেখছি যে তুমিই অন্তর্যামী। এত কষ্টে মনের গোপন ইচ্ছেটুকু লুকিয়ে রেখেছি, তাও ধরে ফেলেছ?'

'ফেলব না কেন? প্রকৃতিটি জেনে ফেলেছি যে।'

'ঘরে একটি বাঘিনী থাকতে কি সে সুযোগ হবে? হয়তো সেই অবলা বলিকগুলোকে কামড়েই দিয়ে আসবে।'

'আসবই তো। ভেবেই তো কামড়ে দিতে ইচ্ছে করছে।'

ও গম্ভীরভাবে বলত, 'তা সে ইচ্ছের কিছুটা পূরণ করতে পার। আসামীর একজন হাতের কাছে হাজির।'

'সে আসামীকে কুচি কুচি করে কাটলেও রাগ মিটবে না।'

বলতাম ঠাট্টা করে।

কিন্তু ক্রমশই যেন ওর সম্পর্কে একটা আক্রোশ ভাবের সৃষ্টি হচ্ছিল। মনে হত যেন ওর তেমন গরজ নেই। নইলে এমন ধীর মাথায় ভবিষ্যৎ জীবনের পরিকল্পনা করছে? বসে বসে পরের অন্ন খাচ্ছে, আর কলেজ যাচ্ছে বাড়ি আসছে?

আর তার মাঝখানে আমায় নিয়ে খেলা করছে।

আমি অতএব ক্রমশ দুর্মুখ হলাম, মুখরা হলাম, রোজগার রোজগার করে ওকে উৎখাত করতে শুরু করলাম।

অথচ সত্যি কীই বা বয়েস ছিল তখন ওর। কী-ই বা বয়েস ছিল আমার। বুঝতে পারি, শুধু যে আমার দুর্দাম বাসনাই এই জ্বালাতন করাত আমায় দিয়ে তা নয়, ওর ওই অন্নদাসত্বও অসহ্য হচ্ছিল আমার।

আমার প্রেমাস্পদ তুচ্ছ একটু অন্নঋণ শোধ করতে সকালবেলা উঠে থলি হাতে বাজারে ছুটবে, পাতানো কাকার জুতো পালিশ করবে, পাতানো কাকিকে ঘুমের সুযোগ দিতে চা বানাবে, ডাল চড়াবে, এ অসহ্য! ভাবলেই আমার আপাদমস্তক রি-রি করে উঠত।

কিন্তু ওর যেন কোনো বিকার নেই।

বলত, 'ছোটো কাজ? কাজের আবার ছোটো-বড়ো কি? আমার কাছে ছোটো কাজের সংজ্ঞা আলাদা। তা ছাড়া কষ্টই বা কি? তুমি কর না এসব কাজ?'

'আমি করি নিজের বাড়িতে।'

'নিজের বাড়ি!'—ও হেসে ফেলত, 'তা বটে। তবে দু'দিন বাদে বাড়িটিও পরের বাড়ি হয়ে যাবে, এই যা।'

'কক্ষনো না। মা আমায় কী দারুণ ভালোবাসে জানো? পর করে দেবে ভেবেছ?'

'বেশ, ওখানে হারলাম। কিন্তু তোমার বউদি? ওই সব ছোটো কাজ করেন না কখনও? তাঁর তো পরের বাড়ি।'

'আহা কী বুদ্ধির ছিরি! বরের বাড়িটা বুঝি পরের বাড়ি?'

'তাও নয়? তাহলে সম্পূর্ণ হারলাম। আপন-পর জ্ঞানটা ঠিকমতো আয়ত্ত করতে পারিনি।'

রেগে বলতাম, 'মহাপুরুষগিরি রাখো, এই অন্নদাসত্বর পালা শেষ কর। কাগজে কত কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখি, দরখাস্ত করে যাও চোখ বুজে। একটা না একটা লেগেই যাবে।'

ও একটু চুপ করে থেকে বলে, 'ভেব না করছি না। তাও করছি। হবে, হয়ে যাবে।'

ও আবার একটু চুপ করে থেকে বলে, 'ধর যদি অনেক দূর চলে যেতে হয়?'

আমি মহোৎসাহে বললাম, 'সে তো আরও ভালো। অজানা সাগরে পাড়ি দেব মোরা দু'জনে। কেটে যাবে দিন শুধু গানে আর কুজনে।'

ও বলল, 'স্বপ্নটা বেশ গোলাপী দেখছি। নেশা টেশা করলে শুনেছি এ-ধরনের গোলাপী স্বপ্ন দেখে।'

'নেশা তো করেইছি—' বলে হেসে উঠলাম।

হঠাৎ ওর চোখে বিদ্যুৎ জ্বলে উঠল। বলল, 'নেশা একলা করতে নেই। দেখি, পানপাত্রটা আমার হাতে দাও তো একবার।'

এই ওর স্বভাব।

কখনও স্থির, কখনও অস্থির।

কখনও বিজ্ঞ, কখনও বেপরোয়া।

কারণ ওর বুদ্ধিটা তীক্ষ্ণ আর মাথাটা ঠাণ্ডা হলেও ওর প্রকৃতি উদ্দাম, ওর বাসনায় বন্যতা। ক্রমশই ওর মধ্যে দুটো সত্তা সমান প্রবল হয়ে উঠছে।

আমার কিন্তু ইচ্ছে হয় এই দুই বিভিন্ন সত্তার সমন্বয় দেখি ওর মধ্যে। কিন্তু তা হয় না, ও কখনও উদাসীন হয়ে বসে থাকে, কখনও দুরন্ত মূর্তিতে প্রকাশিত হয়।

একদিন হঠাৎ এসে বলল, 'ভেবে দেখলাম প্রফেসরি করে কিচ্ছু হবে না। টাকা চাই, অনেক টাকা। অতীত জীবনের সমস্ত গ্লানি মুছে ফেলবার মতো টাকা, ভবিষ্যতের সোনার প্রাসাদ গড়বার মতো টাকা। আচ্ছা, কি করলে বেশ রাশি রাশি টাকা পাওয়া যায় বলতে পারো?'

'বোধহয় চুরি করলে।'

'খবরদার ঠাট্টা কোরো না এখন। মেজাজ খারাপ হয়ে আছে।'

'হল কি?'

'কিচ্ছু না' বলে ও মাথার লম্বা লম্বা চুলগুলো মুঠোয় চেপে টানতে লাগল।

দশ

কি ওর হয়েছিল সেদিন জানি না, কিন্তু সেই দিন থেকে ওর যে একটা পরিবর্তন ঘটেছিল তাতে সন্দেহ নেই। ওর ভিতরকার সেই মানসিক প্রশান্তি—যা দেখে এক এক সময় আমার রাগে গা জ্বালা করত, তা যেন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ও বেশিক্ষণ কথা বলতে পারত না, আমি 'দেরি হয়ে যাচ্ছে' বলে চঞ্চল হয়ে ওঠবার আগেই বলত, 'আচ্ছা, আজ চলি।'

আর কোনো কোনোদিন বলত, 'আকাশ থেকে একবোঝা টাকা পড়তে পারে না? উল্কাপিণ্ডের মতো?'

একদিন বললাম, 'এত টাকার তোমার দরকার কি? যা হোক একটা কাজকর্ম করলেই তো বেশ চলে যাবে আমাদের।'

ও অস্থির গলায় বলল, 'না, সেভাবে খুঁড়িয়ে চলায় আমার সুখ নেই, আমি রথে চড়ে রাজপথে চলতে চাই।'

কেন জানি না হঠাৎ চোখে জল এল।

মনে হল, সেটা কি শুধু তুমি একলাই চাও? কে না চায়? কিন্তু চাইলেই তো পাওয়া যায় না! আর সেটা পাওয়া যাবে না বলে অভিমান করে জীবনের সুন্দর দিনগুলো, কবিরা যাকে নাকি বলে থাকেন 'নবযৌবন', বসে বসে বিকিয়ে দেবে?

কিন্তু মনে হলেই তো ঠিক গুছিয়ে বলা যায় না। ওর মনে এ আগুন তো আমিই জ্বেলে দিয়েছি, ওর চিত্তের প্রশান্তি তো আমিই নষ্ট করে দিয়েছি। ও তো ওর ওই অন্নদাসের জীবনের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে মুঠো মুঠো মাটি দিয়ে পথ তৈরি করতেই চেয়েছিল। ওর গলাতেই তো একদা শুনেছি, 'পৃথিবীর এককোণে রহিব আপন মনে, ধন নয়, মান নয়, এতটুকু বাসা।'

এগারো

এদিকে বাড়িতে আমার বিরুদ্ধে গুঞ্জন উঠছে।

রোজ রোজ বান্ধবীর সঙ্গে এত কি দরকার?

তুমি রোজ যাও, সে তো কই একদিনও আসে না?

তার মানে তুমি হ্যাংলা, সে মানিনী।

না না, এতক্ষণ আড্ডা দিতে যাওয়া চলবে না। ইত্যাদি। ইত্যাদি।

মা বলতেন, দাদা বলত।

আর বউদি টিপে টিপে হেসে বলত, 'কে জানে বান্ধবী না বান্ধব।'

মা তখন আড়ালে রেগে রেগে বলতেন, 'কথা শুনলে গা জ্বলে যায়।'

আমি বুঝতে পারতাম, বউদির উপস্থিতিই আমার পথ কিছুটা সুগম করে দিয়েছে। মা বউদিকে অগ্রাহ্য করবার জন্যেই আমার গতিবিধির এদিক-ওদিককে অগ্রাহ্য করছেন। ভাবটা যেন—তুমি যা খুশি করতে পারো, বোনের বাড়ি যেতে পারো, দোকানে যেতে পারো, আর ও বেরোলেই দোষ? বেশ করবে ও বেড়াত যাবে।

সোচ্চারে না হলেও এই নিরুচ্চার বাক্যই আমার পৃষ্ঠবল ছিল। না হলে বউদির সঙ্গে এই টেক্কা দেওয়াদিয়ি না হলে মা কবেই হয়তো আমার ওপর পাহারা বসাতেন।

বারো

বসাননি পাহারা, তাই আমি যথারীতি ওর সঙ্গে দেখা করছিলাম। কোনোদিন ও প্রতীক্ষা করত, কোনোদিন আমি।

একদিন ও আলো-জ্বলা মুখে এসে বলল, 'বছর সাতেকের জন্যে ছেড়ে দিতে পারবে আমায়?'

বছর সাতেক!

ছেড়ে দেওয়া!

দু'টো শব্দই অবোধ্য।

বললাম, 'ধরলাম কবে যে ছেড়ে দেব?'

'ধরনি? উঃ! আষ্টেপৃষ্ঠে নাগপাশে বেঁধে রেখেছ। যাক শোনো, একটা চাকরি পাচ্ছি দু'বছরের ট্রেনিং, পাঁচ বছরের কনট্রাক্ট সার্ভিস। ট্রেনিংয়ের দু'বছর চোদ্দ-শো করে দেবে, সার্ভিসে সাড়ে তিন হাজার।'

মনে মনে হিসেব করে নিয়ে উৎসাহের গলাতেই বলি, 'তা মন্দ কি? কোথায়? কোন্ কোম্পানি? ওদের বুঝি বাৎসরিক হিসেবে মাইনে?'

দুরন্ত আমার কথা শুনে প্রবলভাবে হেসে উঠল হা-হা করে।

হাসি আর থামতে চায় না।

তারপর বলল, 'বাৎসরিক মানে? মাসিক। বুঝলে? মান্থলি সাড়ে তিন হাজার।'

আমিও অতএব হেসে ফেললাম।

বুঝলাম ঠাট্টা।

বললাম, 'শুধুই মাইনে? তার সঙ্গে একটি সুন্দরী রাজকন্যা নয়?'

'কী ভাবছ, ঠাট্টা? তাহলে এই দেখো।'

ও পকেট থেকে কতকগুলো ছাপানো কাগজপত্র বার করল। ফরম, প্রস্‌পেক্টাস্‌, আরও কি যেন। তারপর আমায় ধরে বসিয়ে বোঝাতে বসল।

সত্যিই ওই রকম অবিশ্বাস্য হারের মাইনে।

কিন্তু কাজটা যে কি তার উল্লেখ নেই। ট্রেনিং নিতে হবে এই উল্লেখ আছে।

আর উল্লেখ আছে শর্তের।

ওই সাত বছরের মধ্যে দু'বছর কোনো ছুটি পাবে না। চাকরির পাঁচ বছরের মধ্যে অবশ্য ছুটি পাবে, বছরে তিন সপ্তাহ, তার মধ্যে দেশে আসতে পারো, কিন্তু সম্পূর্ণ নিজের ব্যবস্থাপনায়, ও বিষয়ে কোম্পানি তোমাকে কোনো সাহায্য করত অসমর্থ।

কিন্তু ছুটিতে তুমি তোমার দেশে আসবে তাতে সাহায্যের প্রয়োজনই বা কি?

তা আছে প্রয়োজন।

চাকরিটি যে পশ্চিম আফ্রিকায়।

আফ্রিকার মানচিত্রের কোণে ছোট্ট একটি নাম। কে জানে সেখানে অরণ্য উপড়ে উপনিবেশ স্থাপনের আয়োজন চলছে, না উপনিবেশ গড়ে ফেলে কাজ করবার মানুষ খুঁজে পাচ্ছে না, তাই সারা পৃথিবীতে প্রলোভনের জাল ফেলেছে। একদল ছেলে চাই তাদের। স্বাস্থ্যবান, কর্মঠ।

পড়বে কেউ না কেউ সে জালে।

হয়তো বা দলে দলেই পড়বে।

পৃথিবীতে বেকারের সংখ্যা তো কম নয়। যারা বেকারিত্বের জ্বালায় বাঘের মুখে যেতেও প্রস্তুত। কুমীরের হাঁয়ের মধ্যে হাত বাড়িয়ে দিতে প্রস্তুত।

'তাই বলে তুমি?' বললাম, 'পাগল নাকি?'

ও বলল, 'কেন পাগল কিসে? টাকার দরকার কি আমার কম?'

'এত কি দরকার?'

ও দৃঢ় গলায় বলল, 'আছে দরকার।'

'আমার ওপর রাগ করে বলছ?'

'না বেবি, তোমার ওপর নয়, হয়তো নিজেরই ওপর। শুধু একটা কথাই বলব—আমাদের দু'জনের মধ্যে এই ভালোবাসা আমার অন্নদাতাদের চোখ এড়ায়নি, আর এই সূত্রেই তাঁরা আবিষ্কার করেছেন পৃথিবীটা শুধু নেমকহারামের বাসভূমি। সে ধারণাটা যে ভুল সেটাই প্রমাণ করতে হবে আমায়।'

এই প্রথম ও 'কাকাবাবু কাকিমা' না বলে 'অন্নদাতা' বলল।

কিন্তু আমাদের ভালোবাসার সঙ্গে ওঁদের সম্পর্ক কি?

আছে বৈকি।

কে না জানে রমেশবাবুর ছেলে নেই, কে না জানে রমেশবাবুকে এবার অবসর গ্রহণ করতে হবে। আর এটাই বা কে না জানে, একটা লোক যদি বিয়ে-থাওয়া করে সংসারী হয়ে বসে, তার আর পুরনো ঋণ শোধ দেবার ক্ষমতা থাকে না, গরজ থাকে না।

এই সব কথাগুলোই হয়তো জানা ছিল অমিতাভর, শুধু এইটা জানা ছিল না—দেবতার মুখ থেকেও এই জানা কথাগুলো বেরোতে পার।

রমেশবাবুকে অমিতাভ দেবতার প্রাপ্য আসনে বসিয়ে রেখেছিল।

হয়তো দেবতার মনেও হঠাৎ ক্ষোভ জন্মাতে পারে, হয়তো দেবতাও হঠাৎ বিচলিত হতে পারে। হয়তো সেটা নিতান্তই সাময়িক। কিন্তু ওই বিশ্বস্তহৃদয় ছেলেটার সে বিচারের ক্ষমতা থাকবার কথা নয়। তাই তার দেবতা আসনভ্রষ্ট হয়ে গেছে, তার হাতের পুষ্পাঞ্জলি স্খলিত হয়ে পড়েছে।

কিন্তু সেই ক্ষোভে সে পাহাড়ের চূড়া থেকে খাদে ঝাঁপ দেবে?

ও বলল, 'একথা বলছ কেন? মানুষ তো শুধু ভ্রমণের পিপাসাতেও পৃথিবীর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে গিয়ে হাজির হয়। ইতিহাসের সাক্ষী হয় সেই সব পর্যটকদের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।'

'সে আলাদা। সেটা স্বেচ্ছাধীন।'

'ওটা ভুল। কোনো সময়েই মানুষ স্বেচ্ছাধীন নয়। প্রতিমুহূর্তেই তাকে পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হয়।'

তবু অনেক কথা বললাম।

অনেক নিষেধ-বাণী, অনেক প্রতিবাদ, অনেক অভিমান, অনেক যুক্তি খরচ করলাম। কিন্তু ও অটল। ও বলছে, কষ্ট হবার ভয় করলে উন্নতির আশা কোথায়?

তেরো

ও কোনো কথাই শুনল না, চলে গেল। আমাকে বলল, 'সাতটা বছর অপেক্ষা করতে পারবে না আমার জন্যে?'

'আমাকে উৎপীড়িত হতে হবে।'

'সইবে আমার জন্যে।'

আমি অভিমানে চুপ করে রইলাম।

ও বলল, 'উপায় থাকলে রেজিস্ট্রিটা সেরে ফেলে যেতাম। কিন্তু আইনের চোখে যে তুমি এখনও নাবালিকা। আশ্চর্য, এখনও এত কম বয়েস তোমার!'

তারপর যাবার আগে ও আমার চোখে চোখে চেয়ে বলল, 'ফিরে এসে তোমায় ঠিক এমনি পাব তো?'

'সন্দেহ হচ্ছে?'

'না, সন্দেহ নয়, ভয়। মনে হচ্ছে যদি বদলে যাও।'

'কে জানে বদলটা কার হয়!'

'আমি? আমি ঠিক থাকব। জলে, জঙ্গলে, অরণ্যে, সভ্যতায়, বর্বরতায়, আদিমতায়।'

'জোর করে কিছু বলা যায়?'

'মনের জোর থাকলে যায়।'

আমার অভিমান ক্ষুব্ধ হল। আমিও মনের জোর দেখালাম। বললাম, 'তোমার বদল না হলে, আমারও বদল হবে না।'

চৌদ্দ

বলেছিলাম।

বলেছিলাম, আমারও বদল হবে না।

কিন্তু আমার বদল হল।

আমার নাম বদল হল, আমার সাজ বদল হল, আমার আচার-আচরণের বদল হল, আমার মুখের ভাষারও বদল হল। আমি এখন কথা বলি শান্ত গম্ভীর মৃদু ছন্দে। আর সেই কথার মধ্যে দার্শনিকের ঔদাস্য থাকে, থাকে আধ্যাত্মিকতার ধোঁয়াটে রহস্য।

আমি ভাবি এগুলি আমার ভান, আমার ছলনা, কিন্তু হঠাৎ এক এক সময় মনে হয়, নাকি ওইগুলোই সত্যি হয়ে উঠেছে আমার জীবনে? ওই ছলনার খোলসের মধ্যেই আমি আমার সত্তাকে সমর্পণ করেছি?

তাই বউদির বোন শানু যখন বলেছিল, 'আশ্চর্য! কুমারী মেয়ে হয়েও তুমি অনায়াসে এতখানি কৃচ্ছ্রসাধন করছ। তোমাকে দেখে আমার নিজের উপর ঘৃণা আসছে বেবি!'

তখন বলতে পারিনি, 'এ-কথা বোল না শানু! বরং ঘৃণা তুমি আমাকেই করতে পার। তুমি তো সরল, সত্যবাদী, খাঁটি। আমি কি? মেকি। ভেজাল। একটা ঝুটো মাল।'

আমি শুধু মিষ্টি করে একটু হেসে শানুর গায়ে হাত রেখেছিলাম। কারণ, মনে হয়েছিল শানু যা বলছে, তা অস্বীকার করা যায় না। আমার মধ্যে আছে নিশ্চয় কিছু। নইলে শঙ্কর মহারাজ কেন ওকে অবহেলা করলেন, আর আমায় এতখানি মর্যাদা দিলেন।

অথচ যে সার্কেলের মধ্যে আমার মর্যাদা, সে সার্কেলটাকে আমি কোনোদিনই মর্যাদা দিতাম না। আমি মনে করতাম—জীবনে যারা বঞ্চিত, যারা ব্যর্থ, যারা পৃথিবীর সত্যকার আলো-বাতাসের স্বাদ পায়নি, তারাই ভগবান ভগবান করে মাথা ঠোকে, তারাই গুরুর দরজায় ভিড় বাড়ায়। অতএব তাদের অভিমতের মূল্য ছিল না আমার কাছে।

কিন্তু এখন যখন সেই গুরুর দরজায় ভিড় করা মেয়ে-পুরুষের দল আমার দিকে ঈর্ষার চোখে তাকায়, তখন আত্ম-অহমিকায় স্ফীত হই আমি।

আসল কথা, আমাদের সত্তা আমাদের পরিবেশের কাছে বিক্রিত। পরিবেশই আমাদের গড়ে ভাঙে। আর সেই পরিবেশের সমীহ দৃষ্টিই আমাদের কাছ সবচেয়ে মূল্যবান।

আগে আগে মা যখন কখনও কখনও তাঁর গুরুভগিনী বা গুরুভ্রাতাদের বাড়িতে ডাকতেন, তাদের জন্যে তটস্থ হতেন, তখন মায়ের উপর কৃপা হত, আর ওদের দেখে হাসি পেত। হাসি পেত ওদের সম্বন্ধে মা-র মূল্যবোধের বহর দেখে। কিন্তু এখন আমি আমার গুরুভ্রাতা বা গুরুভগিনীদের চোখে একটু বিশেষ হয়ে উঠতে পারাকে রীতিমতো গৌরবের মনে করি। অথচ সেই একই শ্রেণীর তো এঁরাও।

পনেরো

কিন্তু ওই 'আমি'টা যেন সমুদ্রের উপরকার ঢেউয়ের মতো। আসল জলটা নয়, জলের ফেনা। কখনও অনেকখানি উঁচু হয়ে ওঠে বলে মনে হয় এটাই সত্য, কখনও হঠাৎ স্তিমিত হয়ে যায়। তখন নীচে দিয়ে বয়ে যাওয়া স্তিমিত জলটা চোখে পড়ে।

সেই রকম স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল আমার 'আমি'টা শানুর যাবার আগের দিন। সন্ধ্যাবেলা শানু আমার কাছে এসে বসেছিল।

আলতোভাবে আমার বিশুদ্ধ শয্যার একাংশে বসে বলেছিল, 'সেই বাড়িটায় আবার যেতে ভয় করছে। সেই শ্বশুরবাড়ি।'

আমার দেবিত্বটা তখন যেন ঝাপসা হয়ে গেল। বললাম, 'তুমি ভারী বোকা শানু, তাই তুমি এই বৈধব্যটাকেই নিজের জীবনের শেষ কথা বলে মেনে নিচ্ছ। তোমার জীবনে অফুরন্ত দিন-রাত্রি, তোমার রূপ আছে, বয়েস আছে, স্বাস্থ্য আছে। তুমি কেন আবার তোমার ভাগ্যটাকে যাচাই করে দেখবে না? ক্লাসে একবার ফেল হলে কি লোকে পড়া ছেড়ে দিয়ে বসে থাকে? এত কিসের ইয়ে তোমার?'

শানু আস্তে বলল, 'তোমার কাছে লুকোব না ভাই, জীবনের প্রতি এখনও সম্পূর্ণ লোভ আছে আমার, লোভ আছে খাওয়া-পরায়, আমোদ-প্রমোদে। তা ছাড়া আর আমায় কেউ ভালোবাসবে না, আমি আর কাউকে ভালোবাসতে পাব না, একথা ভাবতে বসলে চেঁচিয়ে কেঁদে ফেলতে ইচ্ছে হয় আমার, কিন্তু সেকথা চেঁচিয়ে বলতে লজ্জা করে।'

বললাম, 'লজ্জার কিছু নেই শানু, তোমার এই বৈধব্যটা কৃত্রিম। সমাজের আরোপিত একটা

জুলুম। এটাকে জোরের সঙ্গে অস্বীকার কর। তাছাড়া তোমাদের বাড়িটা তো বেশ প্রগতিশীল?' বাপের বাড়িটার কথাই বলি।

শানু নির্বোধ, তবু শানু একটু হেসে বলে, 'প্রগতির পোশাক পরলেই প্রগতিশীল হওয়া যায় না বেবি! এখন আমি একটা রঙিন শাড়ি পরলে দাদা-বউদিরা তো দূরের কথা, আমার বাবা সুদ্ধু বিরক্ত হন। বিধবা মেয়েকে তাঁরা আহা আহা করবেন, কিন্তু তার আবার বিয়ের কথা? ভাবতেই পারবেন না।'

'তাহলে এবারে তোমায় নিজে হাতে ভার নিতে হবে।'

শানু কেমন একরকম চোখে তাকিয়ে বলে, 'লজ্জা আমার সবচেয়ে বেশি বেবি তোমার কাছেই। তুমি অকারণ এইভাবে স্বেচ্ছায় জীবনকে হাত দিয়ে ঠেলে দিতে পারছ—'

আমি লজ্জা পেলাম।

আমি যেন আমার ভেতরটা দেখতে পেলাম, তাই তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'ভুল শানু, ওটা তোমার সম্পূর্ণ ভুল। আমার সব কিছুই ভান। এই বৈরাগ্যটা আমার ছদ্মবেশ।'

ও অবাক হয়ে বলল, 'কিন্তু কেন? তোমার এতে দরকার কি?'

'এমনি মজা। খেলা।'

শানু আরও অবাক হল।

বলল, 'মজা! খেলা! কিন্তু এই খেলাটা যখন আর ভালো লাগবে না?'

'তখন টান মেরে ফেলে দেব লোটা-কম্বল।'

শানু বিশ্বাস করল না। বলল, 'এ তুমি আমাকে স্তোক দিয়ে বলছ '

'না শানু, সত্যিই বলছি। আর সত্যিই তোমায় উপদেশ দিচ্ছি, জীবন জিনিসটা এমন তুচ্ছ নয় যে তুমি শুধু তুচ্ছ একটু লোকলজ্জার মুখ চেয়ে সেটা বরবাদ দেবে। তুমি আবার ভালোবাস, ভালোবাসা নাও।'

শানু একটু বিষণ্ণ হাসল। বলল, 'তুমি এমনভাবে বলছ, যেন আমার জন্যে কী একখানা ভালোবাসা অপেক্ষায় বসে আছে। ভালোবাসাটা আসছে কোথা থেকে?'

'আজ নেই, কাল আসতে পারে। তোমার মনটা প্রস্তুত রেখো তাকে গ্রহণ করবার জন্যে।'

শানু আস্তে উঠে গেল।

শানুর নিশ্বাসটা ঘরের বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল।

আর শানু চলে যেতেই আমার রক্ত উত্তাল হয়ে উঠল। যে ভালোবাসা আমার জন্যে প্রহর গুনছে হাজার হাজার মাইল দূরে বসে, তার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলাম। ইচ্ছে হল ছিঁড়ে ফেলি এই খোলশ, সবাইকে ডেকে ডেকে বলি, শোন তোমরা, আমার ভালোবাসা আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। আমাকে নিয়ে ঘর বাঁধবে বলে মরুভূমিতে সোনা কুড়োতে গেছে। অতীতের সব গ্লানি মুছে ফেলে, সব ঋণ শোধ করে ফেলে ও আমায় নিয়ে ঘর বাঁধবে, তাই আমার এই শবরীর প্রতীক্ষা।'

কিন্তু আবেগকে শাসন করে বুদ্ধি। তাই আমি কিছু বলি না। শুধু আমার ছদ্মনামের খোলশেই স্থির হয়ে বসে থাকি। যখন মা কাঁদো-কাঁদো মুখে বলেন, 'কোনোদিন ভাবিনি তুই এমন হয়ে যাবি—' তখন মৃদু হেসে বলি, 'কেন মা, এ তো বেশ। তোমার কাছেই রয়ে গেছি, ছেড়ে কোথাও চলে যাচ্ছি না—'

মা নিশ্বাস ফেলে বলেন, 'আমার কাছেই বটে!'

বলেন, কারণ মা-র ধারণা আমি এখন আর মা-দের এই জানা পৃথিবীর মানুষ নই, আমি অন্য এক গ্রহের! যেখানে বাসনা নেই, কামনা নেই, বরং ভোগ-সুখের প্রতি তীব্র বিরাগ। সেই এক নির্মল জ্যোতির্লোকে বিরাজ করছি আমি আমার ভগবতী সত্তা নিয়ে।

কিন্তু আমি তো জানি, আমি তোমাদেরই লোক।

আমি যখন একটি বিরল নির্জনতার আশায় বলেছিলাম, আলাদা একটা ঘর না হলে আমার ধ্যান-ধারণার অসুবিধে হয়, তখন সে কোন্ ধ্যানের কথা বলেছিলাম?

সে ধ্যান কি শঙ্কর মহারাজের দেওয়া ইষ্ট-মূর্তির? তা যদি হয়, সে ধ্যান জননীর স্নেহ বাহুবেষ্টনের মধ্যে থেকেও হতে পারত না?

কিন্তু সে ইষ্ট-মূর্তির ধ্যান তো করতে চাইনি আমি। একক শয্যায় শুয়ে ধ্যানে বিভোর হই আমি একটি বলিষ্ঠ পুরুষ-মূর্তির।

রক্ত-মাংসের সজীব পুরুষ।

পাথরের 'নওল কিশোর' নয়। যাঁর প্রেমকাহিনী নিয়ে শঙ্কর মহারাজ ঘণ্টার পর ঘণ্টা কীর্তন করেন, ব্যাখ্যা করেন। শুনি তিনি নাকি বিশ্বের সমগ্র নারীর প্রেমাস্পদ। আর বিশ্বের সবাই তো নারী। তিনি ছাড়া পুরুষ কই এই বিশ্ব ব্রজভূমিতে?

হ্যাঁ, এসব কথা আমার মুখস্থ হয়ে গেছে, কারণ মুখস্থ করার ক্ষমতাটা নাকি আমার অদ্ভুত। এসব কথা আমিও গুছিয়ে বলতে পারি মহারাজের প্রধানা শিষ্যা বৃন্দাদির মতোই। যার জন্যে বৃন্দাদি আজকাল আমায় বিষনজরে দেখতে শুরু করেছেন।

ষোলো

কিন্তু ওসব তো রঙ্গমঞ্চের ভূমিকার সংলাপ।

রাত্রে যখন অভিনয়ের রঙ মুছে নিজের কাছে নিজে ধরা দিই?

তখন কি ধরা দিই না একটি তীব্র রোমাঞ্চময় কল্পনার কাছে?

দিই।

তখন ধ্যান করি এক রক্ত-মাংসের পুরুষের। ধারণা করতে চেষ্টা করি কী তীব্র সুখময় সেই বলিষ্ঠ বাহুর নিষ্পেষণ।

সেই ধ্যান-ধারণার দাহে কোনো কোনোদিন আমি যখন ঘরে টিকতে পারি না, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে বারান্দাকে করি নৈশচারণার ক্ষেত্র, তখন সেই বারান্দার একাংশে অবস্থিত দাদা-বউদির পর্দাফেলা জানলাটার দিকে তাকিয়ে হিংসেয় সর্বাঙ্গ জ্বালা করে ওঠে আমার। আর কোনো কোনোদিন অদম্য হয়ে ওঠে একটা অন্যায় ইচ্ছার আকর্ষণ। আমার থেকে তেরো বছরের বড়ো দাদার ঘরের রাত্রির রহস্য যেন আমাকে তীব্রবেগে টানে অন্ধকারের আড়ালে গা ঢেকে ওই পর্দাকে ঈষৎ উন্মোচিত করে ভিতরে চোখ ফেলতে।

সেই ইচ্ছের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করে শঙ্কর মহারাজের দীক্ষামন্ত্র নয়, নিতান্তই আমার চিরদিনের সভ্যতার সংস্কার, শিক্ষার সংস্কার, শালীনতার সংস্কার।

কিন্তু এসব কি বর্তমান? বুঝতে পারছি না।

অতীতে আর বর্তমানে মিশে গিয়ে যেন একটা কুয়াশার পর্দা দুলছে আমার মধ্যে। আমি বুঝতে পারি না আমার দিনের বেলার 'আমি'টা আর রাত্রে বেলার 'আমি'টা অবিরাম যুদ্ধ করে চলেছে, না একজন অপরজনের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

যদি আত্মসমর্পণ করে থাকে তো স্নায়ুতে শিরাতে এত চাঞ্চল্য কেন? কেন ওর খবরের জন্যে এত ছটফটানি?

সতেরো

আমার দিক থেকে খবর নেবার কোনো উপায় ছিল না কারণ, দুরন্তর ঠিকানার কোনো ঠিক নেই। কোথায় না কোথায় ক্যাম্প পড়ে ওদের, কখন না কখন চিঠি দেবার সময় পায়। তাও তো সে চিঠি আসে আমার এককালের সহপাঠিনী শিপ্রার শ্বশুরবাড়িতে তার স্বামীর নামে। এই ব্যবস্থা করে গিয়েছিল ও।

শিপ্রা কোনো গতিকে আমায় সে চিঠি পৌঁছে দিত। নিতান্তই দীর্ঘ ব্যবধান ছিল সেই চিঠি আসায়।

তার মধ্যে আবোল-তাবোল কথাই বেশি থাকত, তার মধ্যে প্রকাশ পেতে শুধু তার আকুলতা, প্রকাশ পেত বিশ্বাস আর আশ্বাসের ব্যাকুলতা। তবু ওরই মধ্যেই টের পেয়েছিলাম, কাজটা ওর 'বন কেটে নগর বসাবার'। কুলি খাটাতে হয়, বন কাটাতে হয়, অরণ্যের দেবতার অভিশাপ কুড়িয়ে সেখানে আগুন জ্বালাতে হয় শুকনো পাতাকে ভস্ম করতে।

খুব স্পষ্ট করে কিছু লিখতে পারে না। মনে হয় স্পেন্‌সারের ব্যাপারটা কড়া, তাই লেখে 'ভালো আছি।' আর মাঝে মাঝে লেখে 'দিন গুনছি।'

আমি ওর খবর পাই, কিন্তু ও আমার কোনো খবর পায় না।

এক এক সময় ওর অবস্থা ভুলে নিতান্ত সহানুভূতিহীন নির্মম বিচার করে বসি আমি। বলি, 'দিব্যি তো নিশ্চিন্তে বসে দিন গুনছি, দিন গোনার সঙ্গে সঙ্গে যে দিন ফুরোয় তা খেয়াল আছে? তুমি কি জানতে পারছ আমি বেঁচে আছি না মরে গেছি? জানতে পারছ কি, কিভাবে আমার দিন কাটছে?'

আমি না হয় অদ্ভুত একটা হাতিয়ার হাতে পেয়ে গিয়ে আমার শত্রুপক্ষকে ঠেকিয়ে রেখেছি। তারা এই অভাবনীয় অস্ত্রটা দেখে ভয় পেয়ে গেছে, তারা হতাশ নিশ্বাস ফেলে বলছে, 'স্বপ্নেও ভাবিনি তুই এমন হয়ে যাবি।'

কিন্তু তুমি? তুমি কি জানতে পারছ এসব?

আমার এই পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ কোথায় তোমার? অথচ তুমি দিব্যি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছ। কারণ তুমি আমায় প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছ, ঠিক থাকব আমি, বদলাব না।

এ পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ আছে কিনা খোঁজ করতে একদিন রমেশবাবুর বাড়ি গিয়েছিলাম। অনেকটা বুড়ো হয়ে গিয়েছেন যেন। ভারী যেন অসহায়। চুপচাপ বসে রইলেন।

কথা বললেন তাঁর স্ত্রী।

বললেন, 'এই দেখ মানুষ, একটা পরের ছেলেকে পুষে এমন মায়ায় জড়ালেন নিজেকে যে, তার বিহনে একেবারে জবু-থবু হয়ে গেলেন। অথচ তার ব্যবহার দেখ। চাকরি করতে বিদেশ যাচ্ছি বলে চলে গেল, না খবর না কিছু। নেমকহারাম যাকে বলে!'

ভাবলাম, ইচ্ছে করলে কি ও টাকা পাঠাতে পারত না?

হয়তো পারত, হয়তো পারত না।

হয়তো ওই অবিশ্বাস্য মাইনেটা ফাঁদ মাত্র। হয়তে বিনিমাইনেয় খাটিয়ে নিচ্ছে ক্রীতদাসের মতো। কে জানে! প্রাণটা কেমন করে উঠল।

চলে এলাম। আর যাইনি। তাছাড়া যাবার সময়ই বা কোথায়?

না, সময় নেই।

সময়টা আমার আঁট-সাঁট একটা ছন্দের মধ্যে বন্দী হয়ে পড়ে আছে যেন। একটা অক্ষরেরও এদিক-ওদিক হবার জো নেই।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে স্নান সেরে গুরুর দেওয়া ইষ্ট-মূর্তির পট সামনে রেখে মঙ্গল-আরতি করি, ধূপ জ্বালি, ফুল বাছি, মালা গাঁথি, চন্দন ঘষি। তারপর চোখ বুজে বসে থাকি ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

আমার সেই তপস্বিনী মূর্তি দেখে দেখে ক্রমশ বাড়ির লোকেরাও আমায় ভক্তি করতে শুরু করেছে। মা মালি দিয়ে নিত্য ফুলের যোগান করিয়ে দিয়েছেন, ফুল মিষ্টি দই ক্ষীর আনিয়ে রাখছেন ভোগের জন্য, সারা সকাল নিঃশব্দে সংসারের কাজ করেন, বাড়ির সকলকে সামলে রাখেন গোলমাল করা থেকে, পাছে পূজারিণীর পূজার ব্যাঘাত হয়। বউদি পর্যন্ত আজকাল আর মুখে-চোখে ব্যঙ্গহাসির ছুরি উঁচিয়ে ঘুরে বেড়ায় না, ঔদাসীন্যের ছবি হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

ভাবটা যেন এ সংসারের নৈবেদ্যের ভাগটা তো তুমিই লুঠে নিলে, আমার আর এখানে থাকাই বা কেন!

যাক, মনের কথা দেখতে নেই, মোটের মাথায় আছি ভালো। যে দাদা প্রথম-প্রথম কত রাগ দেখিয়েছে, কত তাচ্ছিল্য করেছে, সেই দাদাই দেখি কাজে বেরোবার কালে একবার আমার ঠাকুর-ঘরের দরজায় এসে এদিক-ওদিক তাকিয়ে হাতটা জোড় করে কপালে ঠেকায়।

না, আলাদা কোনো ঠাকুরঘর নয়, আমার শোবার ঘরই আমার ঠাকুরঘর। সেই সরু একফালি ঘরেরই একপাশে চৌকি পেতে বসিয়েছি আমার গুরুর ফটো, আমার ইষ্টের পট। তার সঙ্গে অসুর-নাশিনী দুর্গারও।

শঙ্কর মহারাজের কাছে সর্বধর্মসমন্বয়। তিনি বলেন, 'হলই বা বৈষ্ণবমন্ত্র, অসুরনাশিনী মূর্তিও সামনে রাখা দরকার। মনের মধ্যেকার পাপাসুরকে দমন করতে হবে যে। 'মা', মা হচ্ছেন আশ্রয় আর উনি? ওই 'নওলকিশোর'? উনি হচ্ছেন সখা, বন্ধু, প্রিয়তম, প্রেমাস্পদ। উনি আধার, উনি প্রাণারাম।'

চৌকির উপর অতএব তিন দেবতার ছবি সাজিয়ে রেখেছি ফুলে চন্দনে, ছোট্ট চেলির কাপড়ে, রুপোর বাঁশীতে। ধূপের সৌরভে ঘরের বাতাস পবিত্র হয়ে ওঠে, সকালের আলো এসে আমার মুখে চোখে চুলে ছড়িয়ে পড়ে এনে দেয় একটা দিব্যদ্যুতি, আমার মুদিত চোখের পল্লব কাঁপে না। এসব আমার সাধনা।

আমার সুন্দর সুন্দর সিল্কের শাড়িগুলো পরি আমি পুজো করবার সময় অযত্নে অবহেলায়। কারণ, আমি তো আর বিয়েবাড়িতে নেমন্তন্নে যাই না, যাই না সিনেমা দেখতে, থিয়েটার দেখতে।

যাবার মধ্যে মঠে।

সেখানে সাদা শাড়ি।

দুধ-সাদা ধবধবে।

গুরু যাতে বলতে পারেন, 'বাইরের মতো মনটিও করতে হবে।'

আমি যখন ধ্যান-ধারণা সেরে আবার নরলোকে ফিরে আসি, তখন দাদা অফিস চলে গেছে, দাদার ছেলেটা স্কুলে। বউদি রান্নাবান্না সেরে নিয়েছে। আগে আগে বউদি ওই রান্না-রান্না করে রাগারাগি করত, মস্তবড়ো একটা আইবুড়ো মেয়ে যে একদিন ভাত রাঁধতে পারে না, এর জন্যে অনুযোগ করত, কিন্তু এখন বউদির মুখে চাবি পড়ে গেছে। বউদির রান্নাঘরের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি? আমি তো আমার মায়ের রান্নাঘরে খাই, বিশুদ্ধ, আমিষ-বর্জিত।

পুজোর পর ঠাকুরের ফল-মিষ্টির প্রসাদ, আর পাথরের গ্লাসে চা খেয়ে পেড়ে বসি সেই জপের খাতা। হাজার জপ লিখতে হবে। এতে নাকি কাজ আরও বেশি হয়। 'অক্ষরে'র মধ্যেই নাকি ব্রহ্ম!

গল্পের বই বলে পাগল ছিলাম আগে, লাইব্রেরি বইতে শানাতো না, পাড়াপড়শীর দরজায় হাত পেতে পেতে তবে মিটত কুম্ভকর্ণের ক্ষুধা।

কিন্তু এখন ওসব বই নিষিদ্ধ খাদ্যের মতোই পরিত্যাগ করতে হয়েছে। গল্পের বই, নাটক-নভেল পড়ে সময়ের বৃথা অপব্যবহার করার মতো বোকামীতে মহারাজের বিশেষ ঘৃণা। আর যাতে তাঁর ঘৃণা, তা করতে লজ্জা হবে না?

দুপুরবেলা হবিষ্যান্ন গ্রহণের পর্ব মিটলে দিবানিদ্রার বদলে পড়াশোনা করি, কিন্তু সে তো ধর্মগ্রন্থ। মঠের লাইব্রেরি থেকে আনা, মহারাজের টীকাভাষ্য সংবলিতও হয়তো।

তারপর যখন বেলা পড়ে আসে, তখন মঠ থেকে গাড়ি আসে আমার আর মা-র জন্যে, সন্ধ্যা-আরতি দেখতে যাবার কারণে। বিশেষ সমাদর, বিশেষ ব্যবস্থা।

গোড়ায় গোড়ায় বউদি বলত, 'লক্ষ্যটা তুমি, মা উপলক্ষ্য মাত্র।'

এখন আর বলতে সাহস পায় না।

তা প্রথম প্রথম মা নিয়মিত যেতেন, হয়তো এতবড়ো মেয়েটাকে সন্ধ্যায় একা ছাড়তে সংস্কারে বাধত। কিন্তু ক্রমে সবই সয়। তাছাড়া, রোজ সন্ধ্যাবেলা কাজকর্ম ফেলে আরতি দেখতে যাবেন, এত ভক্তি-ঢলঢল মা-র মন নয়।

মা তাঁর লক্ষ্মী-ষষ্ঠী-মনসা-ইতু বোঝেন, তার জন্যে উৎকণ্ঠিতও থাকেন, কিন্তু আরতি দেখতে রোজ মঠে যাবেন এত সময় বার করতে পারেন না। তাছাড়া, আরতি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে শুরু হয়ে যায় স্তব-স্তোত্র-কীর্তন। তার শেষ হওয়া পর্যন্ত বসে থাকা তো মা-র পক্ষে যম-যন্ত্রণার শামিল।

ক্রমশ তাই গাড়ির আরোহী হই একমাত্র আমি। বউদিকে জিগ্যেস করি, 'যাবে?'

বউদি বলে, 'না, এখন কাজ রয়েছে।'

শানু এক কীর্তি করার পর থেকে বউদি একটু নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। বউদি আশঙ্কা করেনি শানুর মতো একটা ভীরু মেয়ে এমন বেপরোয়াভাবে একটা ছেলের সঙ্গে পালিয়ে যেতে পারে।

লিখে রেখে গেছে নাকি, রেজিস্ট্রি বিয়ে করে স্বামী তাকে নিয়ে চলে যাচ্ছে তার কর্মস্থলে। কিন্তু সেকথা কে বিশ্বাস করেছে? তাছাড়া সেটাও যদি হয়েই থাকে সত্যি, দ্বিতীয়বারের স্বামীকে প্রকৃত স্বামীর মর্যাদাটা দিচ্ছে কে? ওটা যেন পরচুল দিয়ে খোঁপা বাঁধা, ঝুটো মুক্তোর মালা গলায় দিয়ে সাজা।

উনিশ

মা বললেন, 'মেয়েটাকে ওই শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়েই ভুল করলে তুমি বউমা! শাশুড়ি নেই, বুড়ো শ্বশুর, জায়েরা যে যার নিজ নিজ সংসার নিয়েই ব্যস্ত। ওকে কে সামলেছে বল?'

বউদি কপালে হাত রেখেছে।

বউদির মুখে জগতের দুঃখ বেদনা রাগ অপমান। বোনের দ্বারা যে তার মুখ পুড়ল, এটা যেন শুধু তার বোনেরই নয়, সেই দগ্ধ দৃশ্যের দর্শকদেরও অপরাধ।

একে ওকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেছে, 'আজকাল আর এসব না-হচ্ছে কোন্ সংসারে?' কিন্তু অপরাধিনী বোনটাকে সামনে পেলে যে ধিক্কারে জীর্ণ করে ফেলত তাকে তাতে সন্দেহ নেই।

আশ্চর্য! বিধবা ছোটো বোনটার ওপর তো মমতার অবধি ছিল না তার, লুকিয়ে মাংসের চপ খাওয়াত। কিন্তু যেই সে নিজের জীবন গড়ে তুলতে গেল, অমনি সব মমতা কর্পূরের মতো উবে

গেল? তার মানে মমতা ততক্ষণই, যতক্ষণ তুমি ভাগ্যহত! ভালোবাসা ততক্ষণই, যতক্ষণ তুমি নিজের সম্পর্কে অচেতন। সচেতন হয়েছ কি ভালোবাসাটি হারিয়েছ।

শানুর প্রতি আর ভালোবাসা নেই বউদির।

কিন্তু আমার?

আমারও শানুর ওপর ভালোবাসাটা উবে যেতে চাইল কেন? সে কী হিংসেয়? আমার এই দেবিত্বের আবরণ কি এতই ব্যর্থ? শানু যে সেইরকম জীবনটা পেয়ে গেল, যে-রকমটি নাকি একদার 'বেবি' নামের মেয়েটার একান্ত কাম্য ছিল, সেটাই কি আমায় দগ্ধাল? নইলে শুনে এত জ্বালা ধরল কেন ভিতরে?

অথচ আমিই সাহস দিয়েছিলাম ওকে।

কুড়ি

কিন্তু সকল জ্বালা প্রশমিত হয়ে যায় গাড়ি থেকে নেমে মঠের চৌহদ্দিতে পা দিতে দিতে। নিত্যসেবার সুবিধের জন্যে অনেকখানি জমি জুড়ে মালঞ্চ আর তুলসীবন। মালঞ্চে শৌখিন ফুল নেই, আছে দেশী ফুল। গোলাপ, চাঁপা, বেল, জুঁই, টগর, গন্ধরাজ, কাঠছাঁপা, গাঁদা, দোপাটি, কিন্তু কেয়ারির কী বাহার! গাছে গাছে আলোর সমারোহ।

জুড়িয়ে যায় চোখ, জুড়িয়ে যায় মন।

তারপর উঠে যাই নাটমন্দিরে।

সুন্দর ডিজাইনের মোজেক টালি বসানো বিরাট চত্বর, আয়নার মতো নির্মল চকচকে। সেখানে নিঃশব্দ নিস্পন্দ ভক্তবৃন্দ বসে আছেন দু'ভাগে, মাঝখানে পথ রেখে। যে পথ শেষ হয়েছে গিয়ে বিগ্রহের পদপ্রান্তে। নাটমন্দিরের পরে অর্ধবৃত্তাকার অর্ধবেষ্টনী বারান্দা, সেখানেও ভক্তজনের শ্রেণীভাগ। একভাগে মহিলা, একভাগে পুরুষ, যেমন নাটমন্দিরে।

বারান্দার মধ্যে বসবার সৌভাগ্য যাঁদের হয়, তাঁরা হচ্ছেন বিশেষ ভক্ত। বিগ্রহের পিছনে আলাদা কয়েকধাপ সিঁড়ি আছে তাঁদের ব্যবহারের জন্যে। যাঁরা অধিকারী তাঁরা এই নাটমন্দির না মাড়িয়ে পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে সিঁড়িতে ওঠেন, ভক্তপদরজঃ মাথায় ঠেকিয়ে। তারপর ঘেরা বারান্দা দিয়ে বিগ্রহের ঘর প্রদক্ষিণ করে আত্মস্থভাবে এসে বসেন নিজ নিজ স্থানে। নিত্য আসা-যাওয়ায় আপনা থেকেই স্থান একটা করে নির্বাচন হয়ে গেছে।

যেমন জানি, বৃন্দাদি বসবেন একেবারে ঠাকুরঘরের দরজা ঘেঁষে, সত্য ব্রহ্মচারী মোটা থামটার গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে, বারান্দার গায়ে গায়ে ছেলেদের দিকে ব্রহ্মচারী অভয়, বীরেশ্বরভাই, নিত্যমহারাজ, অচ্যুতানন্দ, মেয়েদের দিকে সুধাদি, অমলাদি, নীলিমাদি, বুড়িমহামায়া মা, রাইকমল, ব্রজরাধা।

এঁদের দু'জনেরও শঙ্করজীর দেওয়া নাম। এই বারান্দার এদিকের এঁরা সবাই এই আশ্রম বা মঠের অধিবাসী, এঁদের এখানে কিছু কিছু ভূমিকা থাকে।

যেমন আরতির পর কীর্তনের সময় ব্রহ্মচারী অভয় আর বীরেশ্বরভাই খোল বাজান, এঁরা সবাই দোহার দেন।

মূল গায়েন শঙ্করজী।

আরতিও তিনিই করেন।

সে এক অপূর্ব নৃত্যভঙ্গিমা! কত তার মুদ্রা, কত তার ছন্দ! প্রৌঢ় শরীরেও কী শক্তি? আরতির সময় এদিক থেকে শুধু পিঠটি দেখা যায়, আর আবিষ্ট আচ্ছন্ন হয়ে দেখতে হয় সেই স্বাস্থ্য-সংগঠিত

সুগৌর পিঠ, পাঁজর, কাঁধ আর দু'টি পা। গরদের ধুতি থাকে পরনে, গায়ের রঙের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যায় সেই দুধে-গরদের ধুতি। কাঁধে থাকে একখানি পাট-করা উত্তরীয়, বার বার খসে খসে পড়ে, বার বার তাকে কাঁধে তোলেন, সেও এক মধুর ভঙ্গি।

তারপর যখন আরতি শেষ হয়, ঘুরে দাঁড়ান শঙ্করজী, তখন তাঁর শ্বেতচন্দনচর্চিত ললাট, কুঁদে-কাটা মুখ, আজানুলম্বিত গোড়েমালা পরা বুক আর আশ্চর্য উদাস দু'টি পদ্মপলাশ চক্ষু, দেখে সকলের মনেই একটি প্রশ্নের উদয় হয়, নদীয়ার গৌরাঙ্গ কি আবার অবতীর্ণ হয়েছেন এই কলির শেষপাদে?'

প্রৌঢ় শরীরে এত লাবণ্য?

প্রৌঢ় মুখে এত দীপ্তি?

প্রৌঢ় চোখে এত আলো?

নিত্য দেখা চোখ, তবু প্রৌঢ়া বৃদ্ধা নির্বিশেষে মহিলাকুল বিহ্বল দৃষ্টি মেলে বলেন, 'কী চোখ দেখেছ? যেন কাজলপরা! হাত-পায়ের তেলোর রং দেখেছ? যেন আলতা-মাখা! মহাপুরুষের পরিচয়ই তো এইসব লক্ষণে।...আহা, নদের গৌরাঙ্গ না দেখার আক্ষেপ মেটালেন বাবা!'

কেউ বলে 'বাবা', কেউ বলে 'মহারাজ', কেউ বলে 'ঠাকুর'।

আমি কিন্তু ওসব কিছু বলি না, বলি 'গুরুদেব'। আমি ওটা 'শিক্ষক' অর্থে বলি। এসেছিলাম তো সন্দেহ কৌতুক আর তাচ্ছিল্যের মনোভাব নিয়ে, তাই প্রচলিত সম্বোধনগুলো হাস্যকর ঠেকেছিল আমার কাছে।

কিন্তু সন্ধ্যারতির সময়কার ওই পঞ্চ-প্রদীপের শিখার কম্পনে, নিয়নের নীল আলোয়, ভারী ঘণ্টার গম্ভীর ধ্বনির ছন্দময় ধাক্কায়, আর গোড়েমালা পরা এই দেবপ্রতিম মূর্তির লাবণ্যে ক্রমশ আমিও যেন আবিষ্ট হয়ে যাচ্ছি। একদা যে কৌতুক আর তাচ্ছিল্য নিয়ে তাকিয়েছি, সেকথা ভেবে লজ্জিত হচ্ছি, আর যখন বহু গুণীজ্ঞানী পণ্ডিত, বহু মানগণ্য বুদ্ধিজীবী, চিন্তাজীবী এসে এই পদপ্রান্তে মাথা লোটান, তখন মনে হয়, 'আচ্ছা, এঁরা কি সবাই অন্ধ অবোধ? যত বুদ্ধিমান আমি?'

আবার যখন সরে আসি সেই আবেষ্টন থেকে, তখন ভাবি, আসেন তো (গুরুদেবের ভাষায়) ত্রিতাপ জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে আশ্রয়ের আশায়। কিন্তু সে আশ্রয় কি মেলে এঁদের? প্রশ্ন তো সেইখানেই। এঁরা যে মন নিয়ে লটারির টিকিট কেনেন, সেই মন নিয়েই হয়তো ঠাকুরের কাছে আসেন। যার জীবনে যত ফাঁকি, যত ফাঁকা, তার তত ব্যাকুলতা।

একুশ

তবু বিকেল না হতেই মন টানতে থাকে। স্নান করে, কপালে একটু চন্দন-রেখা এঁকে, দুধ-সাদা শাড়ি-ব্লাউজ পরে প্রস্তুত হয়ে বসে থাকি গাড়ি আসার আশায়।

এই গাড়ি পাঠানোর ব্যাবস্থার পর থেকে মঠের কেউই আর আমায় সুচক্ষে দেখে না, প্রত্যেকের চোখেই যেন বিরক্তির বিরূপতা, হিংসের জ্বালা। মুখভঙ্গিতে যেন এই অভিযোগ ফুটে ওঠে, 'খুব দেখালে বাবা! উড়ে এসে জুড়ে বসলে একেবারে!'

কিন্তু আমি কি করব?

আমার কি দোষ?

আমি তো আর আবদার করে এ সুযোগ আদায় করে নিইনি! শঙ্করজী নিজেই নাকি বলেছেন, 'দেবীমা না এলে কীর্তনে প্রাণ আসে না।'

আর নিজেই নাকি রোজ হুঁশ করে ড্রাইভার হরিচরণকে বলে দেন, 'ওরে দেবীমাকে ঠিক সময় আনতে যাস।'

কেন এই পক্ষপাতিত্ব?

সত্যিই কি তবে আমি ভগবতীর অংশ?

'ভগবান ভগবান' করলে মানুষ যেন কেমন ভোঁতা হয়ে যায়। বিশেষ করে মেয়েমানুষ। গুরুর এই পক্ষপাতিত্বে সুধাদি, অমলাদি, রাইকমল, ব্রজরাধা ঈর্ষায় জ্বলে মরে, টেনে টেনে বাঁকা বাঁকা কথা শোনায় আমায়, কিন্তু কই, গুরুর কাছে গিয়ে সোজা সতেজ কৈফিয়ত চায় না তো, 'দেবী না এলে যদি কীর্তনে প্রাণ আসে না, তবে এতদিন কি আপনি আমাদের প্রাণহীন গান শুনিয়ে রেখেছিলেন?'

চায় না কৈফিয়ত।

কিন্তু আমি হলে চাইতাম।

আমি চেয়েওছি, অন্য কারণে।

প্রথম প্রথম যখন দেখেছি প্রসাদ পাবার দিন পংক্তি-ভোজনে বসেও প্রসাদের দুর্লভ অংশটুকু পড়ল আমার পাতে, অথবা হরির লুঠের সময় সন্দেশের জোড়াটি পড়ল আমার হাতে, তখন লজ্জায় কুণ্ঠায় মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে।

চাইলাম একদিন কৈফিয়ত।

যখন দুপুরের বিশ্রামের পর বিগ্রহের সামনের সেই অর্ধ-বৃত্তাকার বারান্দায় পায়চারি করছেন অলস চরণে, নবীনদার অপেক্ষায়। চারটে বাজলে নবীনদা এসে ঘণ্টা দেয়, বিগ্রহের দরজার ভারী তালাটা খুলে ফেলে দরজা হাট করে দেয়।

তখনও চারটে বাজেনি (আমি সেদিন প্রসাদ পাবার পর মঠেই রয়েছি কী একটা উৎসব বাবদ) আমি গিয়ে উঠলাম সেই বারান্দার সামনে নাটমন্দিরে। স্পষ্ট সতেজ গলায় প্রশ্ন করলাম, 'সবাই তো আপনার শিষ্য, আমাকে তবে 'বিশেষ' করেন কেন?'

হঠাৎ যেন চমকে উঠলেন উনি। হয়তো এ ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়নি ওঁকে কোনোদিন। হয়তো ওর উল্টোটা শুনে থাকবেন কোনো জল-ভরা চোখ আর অভিমানরুদ্ধ কণ্ঠ থেকে।

এটা অপ্রত্যাশিতই।

তাই হাঁটা থামিয়ে বললেন, 'কি বলছিস মা?'

আমি আমার প্রশ্নের পুনরুক্তি করলাম। বললাম, 'উত্তর দিন।'

এবার আস্তে আস্তে ওঁর সেই নিখুঁত কাটের সুগৌর মুখে ছড়িয়ে পড়ল একটি প্রসন্ন হাসির আলো। ওঁর আলতা-রাঙা ঠোঁটে ফুটে উঠল একটু মৃদু মধুর হাসির আভাস।

বললেন, 'এ প্রশ্নের আবার উত্তর কি রে? তুই আমার মা যে, তাই।'

'এখানের সবাই আপনার মা।'

'তুই হচ্ছিস ব্রহ্মময়ী মা।'

'না। আমি সাধারণ একটা মেয়ে।'

উনি মিষ্টি হেসে বলেন, 'তুই কি, তা কি তুই নিজে জানিস? তুই কি নিজেকে দেখতে পাস? যেমন আমি পাচ্ছি?'

আমার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল।

আমার মনে হল সার্চলাইট জ্বেলে উনি আমার অন্তরের অন্তঃস্থল পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছেন।

ভয়ে থর থর করে উঠল ভিতরটা।

আমার ভিতরে এখন কিসের কুটিলতা উঁকি মারছে সে তো আমি জানি। জানি, সেকথা ওই দেবোপম প্রৌঢ় মানুষটি সম্পর্কে ভাবাও মহানরক, তবু আমার মনের মধ্যে ছিল সে সন্দেহের গ্লানি।

আমি ভাবছিলাম ওঁর ওই কাজল পরার মতো চোখে যে দৃষ্টি, সে কি পিতৃদৃষ্টি? যে কণ্ঠ আমায় 'দেবীমা' বলে আদরের সম্বোধন করছে, সে কি পিতৃকণ্ঠ?

এ সন্দেহ দেখতে পাচ্ছেন তবে উনি?

আমার কিছুক্ষণ আগের সাহসটা হারিয়ে গেল। আমি আস্তে বললাম, 'তা হোক আমার লজ্জা করে। সবাই তো শিষ্য, সবাই সমান।'

উনি বললেন, 'এই তো পরীক্ষায় জয়ী হলি। আরও পরীক্ষা আসবে। অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তবে তো সীতাদেবী হবি।'

তখন মনে হল ওঁর দৃষ্টিতে যে আলো, সে আলো স্বর্গের আলো। ওঁর কণ্ঠে যে মাধুর্য, সে মাধুর্য মন্দাকিনীর ধারার। মরমে মরে গেলাম।

মাথা হেঁট করলাম।

বাইশ

সেদিন বাড়ি ফিরেই দেখলাম শিপ্রা এসেছে।

শিপ্রা আসা মানেই দুরন্তর চিঠি আসা।

প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লাম ওর ওপর।

মনে হল ও যেন আমার উদ্ধারকর্ত্রী হয়ে এল। ভগবান বলে যদি সত্যি কেউ থাকে, তাহলে যেন এই চিঠিতে দুরন্তর ফেরার খবর থাকে।

কিন্তু থাকবে কেন?

সাত বছরের পাঁচটা বছর তো মাত্র শেষ হয়েছে। আরও সবচেয়ে দীর্ঘ দু'টো বছর।

সবচেয়ে দীর্ঘ বৈকি।

শুনেছি কোথায় নাকি কোন্ জেলখানায় একটা কুড়ি বছরের কারাদণ্ডের আসামি উনিশ বছর এগারো মাস কতদিন যেন কারাযন্ত্রণা ভোগ করে মুক্তির কয়েকটা দিন আগে যন্ত্রণা অসহ্য মনে হওয়ায় আত্মহত্যা করেছিল। জানি না গল্প না সত্যি, তবু এটা ঠিক প্রতীক্ষার শেষ প্রহরটাই সবচেয়ে দীর্ঘ।

শিপ্রা বলল, 'তোকে দেখে মনে হচ্ছে অমিতাভবাবু এসে মাথার চুল ছিঁড়বে। এ তো রীতিমতো বৈরাগিনী অবস্থা! ঘরে আবার এই সব ঠাকুর-দেবতা!'

হেসে বললাম, 'তুই তো সবই জানিস।'

'জানি। কিন্তু এও জানি, জগতে সবচেয়ে বদলায় মানুষের মন।'

'তোর জানার জগতের বাইরেও অনেক কিছু আছে। বল এখন খবর। চিঠি আছে?'

ও একটু হেসে বলল, 'আছে চিঠি, কিন্তু তোর দুরন্তর নয়, নিতান্তই আমার।'

বলে একটা নেমন্তন্নর চিঠি বার করল। ছেলের অন্নপ্রাশন।

হঠাৎ ভয়ঙ্কর একটা রাগে আপাদমস্তক জ্বলে গেল।

জানি না কিসের সেই রাগ।

আশাভঙ্গের?

না হিংসার?

হয়তো তাই। মনে হল ও যেন আমার এই অস্বাভাবিক জীবনের সামনে ঘটা করে দেখাতে এসেছে ওর সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের ঐশ্বর্যের ভাব।

রুক্ষ গলায় বললাম, 'তুমি তো জান, এখন আর এসব সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিই না আমি।'

শিপ্রা ম্লান গলায় বলল, 'খোকার মুখে-ভাত এ আর এমন কি সামাজিক ব্যাপার? ক'জনকে তো মাত্র বলছি।'

'ক'জনকে কেন? চিঠি-পত্তর ছাপিয়ে দিব্যি তো—'

ও আরও ম্লান গলায় বলল, 'চিঠিটা আমার সাধ। লোকেদের ছেলের ভাতে পাই। তা যাওয়া যদি নেহাত অসম্ভব হয়, জোর করব না।'

আমি হঠাৎ হেসে উঠলাম।

বললাম, 'বাবা, মেয়ে একটু ঠাট্টা বোঝে না। যাব, যাব, যাব। তোর খোকাকে আশীর্বাদ করতে যাব। তবে জানিস তো বৈষ্ণবের ভেক? খেতে-টেতে বলিস না। বলিস ওর শরীর খারাপ।'

ও কি বুঝল কে জানে।

বলল, 'আচ্ছা।' তারপর আস্তে আস্তে উঠে গেল।

আর হাসল না।

হয়তো ভাবল আমি আর ওদের জগতে নেই।

ভাবলাম, নাঃ, একটু সেজে-গুজে যেতে হবে নেমন্তন্নে। কলেজের বন্ধুরা আসবে। হয়তো শিপ্রার মুখে আমার বৈষ্ণবের ভেক-এর গল্প শুনেছে, হয়তো কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে আছে কেমন না জানি হয়ে গেছি আমি। তাজ্জব করে দেব তাদের। সাজে ঝলসাব, হাসিতে কথাতে ঝলসাব।

শিপ্রারও অভিমান ভাঙবে।

তেইশ

কিন্তু শিপ্রার অভিমান ভাঙবার এত গরজ কেন আমার? ভালোবাসার দায়?

ভেবে দেখলাম তাই বটে, তবে সে ভালোবাসাটা শিপ্রার জন্যে নয়। দুরন্তর ভালোবাসার দায়ে আমি শিপ্রার মন রাখতে বসছি। শিপ্রা রেগে গেলে যদি চিঠির ব্যবস্থা বানচাল হয়ে যায়!

ন'মাসে ছ'মাসে তবু আসে তো খবর।

জানতে তো পারি ও বেঁচে আছে।

শিপ্রা চলে গেলে হঠাৎ খুব কাঁদলাম, জানি না কেন। শিপ্রাকে আঘাত করলাম বলে? চিঠি পাইনি বলে? নাকি সেই তখন মাথা হেট করে ফিরে আসতে হয়েছিল বলে?

মনে হল হয়তো তাই।

সেই গ্লানিই আমাকে রুক্ষ করে তুলেছিল।

তখন মনে হতে লাগল, দেবতা না ছাই, লোকটা সম্মোহন জানে। আর জানে কথার চাতুর্য। কথার চাতুরিতেই দেবতার আসনের টিকিট সংগ্রহ করে রেখেছে।

যেই অসুবিধেয় পড়ে যায়, সেই কথার জাল ফেলে। অগ্নিপরীক্ষা, অনেক কিছু বলে আমাকে জব্দ করে ফেলে। আমি আর যাব না। আমার আর ভেক-এর দরকার নেই। মাকে বলব, 'আশা করে গিয়েছিলাম, কিন্তু কিছু পেলাম না ওখানে।' বউদিকে বলব, 'তোমরা এত ভক্তি কর তাই বাজিয়ে দেখতে গিয়েছিলাম।'

তারপর?

তারপর বলব, 'আমি আবার পড়ব। এম. এ-টা দিয়ে ফেলব।'

দু'টো বছর ওতেই কেটে যাবে। তার মধ্যে আমাকে কেউ জ্বালাতে আসবে না। তাছাড়া মা-র সেই ভয়ঙ্কর আবেগটা চলে গেছে। মা যেন মেনেই নিয়েছেন আমার এই জীবন। আমি মা-র কাছে না-শুলেও মা-র হেঁসেলে যে খাই, সেটাতেই মা-র সুখ।

আর—আর হয়তো বা—এই সংসার রণক্ষেত্রে প্রবল প্রতিপক্ষের সামনে একান্ত নিঃসহায় হয়ে পড়ার থেকে, এই পৃষ্ঠবলটুকু মা-র কাছে এখন ভাগ্যের দান বলে মনে হচ্ছে। তাছাড়া বউদির বোনের সঙ্গে মা-র মেয়েকে তুলনা করে মা যেন অনেকটা উঁচু আসনে উঠে গেছেন।

দিদি থাকে রেঙ্গুনে, মেজদি কোয়েম্বাটুরে।

ওরা কদাচ আসে। অথবা আসে না। ওদের সঙ্গে এ সংসারের নাড়ির যোগ ছিন্ন হয়ে গেছে, হয়তো বা মা-র সঙ্গেও। দূরে থাকতে থাকতে বুঝি মন থেকেও দূরে চলে যায়। মা-র ব্যবহার দেখলে মনে হয়, একটাই মেয়ে আমি মা-র।

দু'-এক বছরে দিদিরা কেউ একটা চিঠি দিলে, মা আমায় বলেন, 'ওরে বেবি, তুই-ই একটা উত্তর দিয়ে দে। আমার তো সেই সাতজন্ম দেরি হবে!'

বড়দির বিয়ে হয়ে গেছে আমার জন্মের আগে, মেজদির আমার নিতান্ত শৈশবে। দেখেছিই বা কবে? তবু আমিই চিঠি লিখি গুছিয়ে গুছিয়ে। অনেকদিন পরে দিদিরা সে চিঠির উত্তর দেয়, আমাকে নয়, মাকে। হয়তো লেখে, 'বেবি বেশ গুছিয়ে চিঠি লিখতে শিখেছে।' হয়তো লেখে, 'বেবির বিয়ের বয়েস পার হয়ে গেল। আমাদের কোন্‌কালে বাড়িছাড়া করে দিয়েছ। কোলের মেয়েটিকে বেশ কোলে রেখে দিয়েছ।'

দূরে থাকলেও বয়সের হিসেবটা ঠিক রেখেছে।

কিন্তু আর কি চিঠি আসে দিদিদের?

কই?

বহুদিন তো আসেনি।

মাকে হঠাৎ জিগ্যেস করলাম।

মা ভাঁড়ারের দরজায় বসে চালের কাকর বাছছিলেন। আমার ঠাকুরের ভোগ হয়, একটি কাঁকর থাকলে চলে না।

আশ্চর্য, এ সব যে আমি শিখলাম কোথা থেকে!

মা হঠাৎ আমার মুখে এরকম একটা সংসারী কথা শুনে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'এসেছিল।'

'কার? বড়দির? না মেজদির?'

আঃ, কতদিন এই নামগুলো উচ্চারণ করিনি। বেশ লাগল।

মা তেমনি ভাবেই বললেন, 'দু'জনেরই।'

'কই বলনি তো আমায়? জবাব দেওয়া হল না।'

মা আস্তে বললেন, 'দিয়েছি। আমিই দিয়ে দিয়েছি। তুমি ব্যস্ত থাক।'

সহসা লক্ষ্য পড়ল, মা আর আমায় 'তুই' বলেন না। কতদিন বলেন না?

আমার অভিমান হল। বড়ো মেয়েদের চিঠি মা নিজে লিখেছেন বলে নয়, আমাকে 'তুমি' বললেন বলে।

অথচ মা আমায় 'তুমি' করে কথা বলছেন অনেকদিন। বেবির বদলে আলতো করে 'দেবী'ও বলেছেন কতদিন যেন। দাদাও যেন ওই 'ব' আর 'দ'য়ের মধ্যবর্তী কি বলে।

বউদি অবশ্য দেবী বলে না, কিন্তু বেবিই বা কবে বলে? ডাকেই না তো!

হঠাৎ আমার সেই পুরনো নামটার জন্যে ভয়ানক মন কেমন করে উঠল। মনে পড়ে গেল দুরন্তর সেই প্রথম আদরের অভিব্যক্তি।

বেবি, বেবি! কচি খুকু! আহা-হা! লজেন্স খাবে খুকু? ডল্ পুতুল নেবে?

মনে হল এসব নিশ্চয়ই আর মনে নেই ওর। ও বিচ্ছিরী রকম বদলে গেছে। ও হয়তো কাটখোট্টা হয়ে গেছে, হয়তো নিগ্রোদের মতো দেখতে হয়ে গেছে। ইচ্ছে করে ভাবতে বসলাম ওইসব, তারপর কাঁদতে বসলাম।

বসলাম ঘরের দরজা বন্ধ করে সন্ধ্যার ধ্যান-ধারণার ছুতোয়।

কেঁদে কেঁদে বললাম, 'জীবনের সব সোনার দিনগুলো বরবাদ করে দিয়ে সোনা কুড়চ্ছো তুমি! ফিরে এসে যদি আমায় না পাও?'

তারপর চোখ মুছে উঠলাম।

মনের জোর করে বললাম, পাবে না কেন, আমি তো আর সত্যি বদলাচ্ছি না।

আর ও যদি বদলে আসে? ভেঙে চুরে তচ্‌নচ্‌ করে দেব সেই বদল।

চব্বিশ

পরদিন বাড়িতে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল।

শানু এল তার নতুন বরকে নিয়ে।

শুনলাম আগে থেকে নাকি নেমন্তন্ন করা হয়েছে।

বউদি দেয়ালকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, 'কী আর করব, মায়ের পেটের মা-মরা ছোটোবোন, ফেলব কি করে? ভাই-ভাজ তো ত্যাগ করেছে, ও বেচারী যায় কোথায়?'

সত্যি, যায় কোথায়? আদর খাবার একটা জায়গা তো দরকার ওর।

অতএব এল।

নতুন শাড়ি-গহনায় ঝলমলিয়ে ঠিক নববিবাহিতার মূর্তিতেই এল। চোখের কোণে সেই ঔজ্জ্বল্য, মুখের হাসিতে সেই মাধুর্য। আগেকার লাজুক লাজুক কুণ্ঠিত কুণ্ঠিত ভাবটা আর নেই, মুখে-চোখে আর এক মোহময় লজ্জার আবেশ।

আগে আমি দেখিনি, মা এসে চুপি চুপি বলেছিলেন, 'যা-ইচ্ছে হচ্ছে এখন সংসারে। শানু তো বর নিয়ে নেমন্তন্নে এল। মাংস রান্না হচ্ছে ঘটা করে। চপ-কাটলেটও হবে মনে হয়।'

সব কিছু শুনে হঠাৎ মনে হল, এখন খাবার ঘরের টেবিলে বসেই ওসব খেতে পারবে শানু সবার সামনে।

তার মানে 'বাধা' জিনিসটা কেবলমাত্র একটা লোকাচার।

লজ্জা জিনিসটা শুধু একটা কাগজের দেয়াল।

তাহলে আমারও কিছু ভাবনার নেই।

আমিও আবার আমার এই ব্রহ্মচর্যের খোলস ফেলে সহজেই রঙে রসে উথলে উঠতে পারব।

মা বললেন, 'সিঁদুর পরেছে সিঁথি জুড়ে।'

বিরক্ত হয়ে বললাম, 'বিয়ে হয়েছে, পরবে না কেন?'

মা ভয়ে ভয়ে সরে গেলেন।

মা-র তাঁর এই দেবীকন্যার বিরক্তিতে বড়ো ভয়।

পঁচিশ

আমি অবশ্য নিজে উঠে দেখা করতে গেলাম না। শানুই এল একসময়।

ঘরের বাইরে অস্ফুট একটু কণ্ঠ শুনলাম, 'এই হচ্ছে দিদির ননদের ঠাকুরঘর।'

শানুও আমায় আর 'বেবি' বলল না, বলল 'দিদির ননদ'।

তারপর ঘরে এসে দাঁড়াল দু'জনে হাসিমুখে।

শানুর মুখে নবোঢ়ার রং, শানুর বরের মুখে নতুন বরের খুশি। ওরা যে পরস্পরকে ভালো-বেসেছে তাতে সন্দেহ নেই।

এতক্ষণ ভাবছিলাম, দেখা হলে বলব শানুকে, 'দেখলে তো শানু, জীবন জিনিসটা কত দামী?

দেখলে তো ওকে হারিয়ে ফেললেই 'হারিয়ে গেল' বলে পরকালের পথ খুঁজতে বসতে নেই। আবার তাকে আহরণ করে নিতে হয়।'

কিন্তু বলতে পারলাম না।

হঠাৎ ওদের সামনে নিজেকে ভারি বেচারি মনে হল। মনে হল, আমাকে ওরা করুণার দৃষ্টিতে দেখছে। আমি ওসব কথা বললে ওরা হেসে উঠবে। বলবে, তুমি জীবনের বোঝ কি হে?

অতএব আমি 'দেবী মা'র খোলসে ঢুকে পড়লাম।

খুব নরম মিষ্টি আর করুণার হাসি হেসে বললাম, 'সুন্দর দেখাচ্ছে তোমায় শানু!'

শানুর বরটা একটু প্রগল্‌ভের মতো বলে উঠল, 'আর আমায় বুঝি খুব খারাপ দেখছেন?'

আমি আরও মিষ্টি হেসে ওকে নস্যাৎ করে দিয়ে বললাম, 'তোমায় তো আগে দেখিনি ভাই!' মনে হল অনেকটা উঁচুতে উঠে গেলাম ওদের থেকে।

তারপর ওদের হাতে আমার ঠাকুরের প্রসাদ দিলাম।

আর তারও পর শানু ছোট্ট একটি রুপোর মালা দিয়ে আমার ঠাকুরকে প্রণাম করে লাজুক হেসে বলল, 'আমার মানত ছিল।'

চলে গেল তারপর।

অনেকদিন পরে এ বাড়িতে হাসি আমোদ হই হুল্লোড় শোনা গেল। দাদার খোলা গলার হাসিটা যেন অপরিচিত মনে হল।

ছোট্ট একটি পাষাণ দেবতার ভারে পাহাড় চাপিয়ে রেখেছি আমি সংসারে, আজ ওরা সে সংসারে আর একটা জানলা খুলে একটু নিশ্বাস নিচ্ছে।

শুনলাম দাদার ছেলেটা নাকি এই ক'ঘণ্টাতেই মেসোর পরম ভক্ত হয়ে গেছে। বলছে নাকি মাসির সঙ্গে আসানসোলে চলে যাবে।

আচ্ছা, নিত্য হাজার ইষ্টনামের অবদানেও ঈর্ষা জিনিসটা যায় না কেন?

মঠে দিদিরা আমায় ঈর্ষা করে, আমি তুচ্ছ শানুকে ঈর্ষা করছি। অথচ ওই ছেলেটার দিকে ফিরেও তাকাই না আমি, যে ছেলেটা পিসিকে না ভজে মাসিকে ভজতে চাইছে।

ছাব্বিশ

পরদিন বউদিকে তাজ্জব করে দিয়ে ওর ঘরে গিয়ে বললাম, 'এই বউদি শোন, তোমার কী সব বেনারসী-টেনারসী আছে বার কর তো! আমায় ধার দাও একটা ঘণ্টাকয়েকের জন্যে।'

বউদি হাঁ করে তাকাল।

আমি মজা পেলাম।

আবার তেমনি হাল্কা গলায় বললাম, 'আরে শোন তাহলে, নিজের ভালো শাড়ি-টাড়ি তো পরে পরে ঠিক করেছি, এদিকে শিপ্রা ছেলের ভাতের নেমন্তন্ন করে গেছে। ভীষণ নাকি ঘটার ব্যাপার, খুব সেজেগুজে যাবার হুকুম।'

এটা বানালাম। লজ্জা ঢাকলাম একটু।

কিন্তু তাতে কি?

আমার সব কিছুই তো বানানো। সবই তো মিথ্যে। সমুদ্রে শয়ন যার, গোস্পদে কি ডর তার?

বউদি কৃতার্থমন্য হয়ে ওর সমস্ত দামী শাড়িগুলো আলমারি থেকে বার করে খাটের ওপর স্তূপাকার করে রাখল। তারপর একখানা সাদা জরির ছোটো ফুটকি দেওয়া গাঢ় সবুজের হালকা বেনারসী তুলে সাবধানে বলল, 'এটা তোমায় খুব মানাবে।'

সরু একটা মুক্তোর মালাও দিল ভয়ে ভয়ে, দিল মুক্তোর কানবালা।

আমার ঘরে আয়না নেই, বউদির ঘরেই সাজতে বসলাম আয়োজন উপকরণ নিয়ে।

বউদি খুব সাবধানে বলল, 'ড্রেসিং-টেবিলে পাউডার-টাউডার সবই আছে। তোমার পুরনো বন্ধুবান্ধবরা আসবে সবাই। কত সাজবে তারা!'

বলে চলে গেল।

হঠাৎ ভারী আশ্চর্য লাগল। আর ভারী লজ্জা হল।

মনে হল বউদির প্রতি এতদিন অবিচার করে এসেছি। মনে করেছিলাম শাড়ির প্রসঙ্গে বউদির মুখে হয়তো একটু বাঁকা হাসি ফুটে উঠবে।

কিন্তু বউদির চোখের কোণে বাষ্পের আভাস দেখলাম।

তাই তাড়াতাড়ি পালাল বউদি।

তার মানে আমার জন্যে তার মনেও অনেকখানি মমতা সঞ্চিত আছে। আমার এই অকারণ কৃচ্ছ্রসাধনে দুঃখ পায় বউদি। হয়তো গতকাল যখন শানুর পাতে ভেটকীর ফ্রাই ভেজে ভেজে দিচ্ছিল, তখন আমার জন্যে ওর মন কেমন করছিল। জিনিসটা একদা ভারি প্রিয় ছিল আমার।

মনে ভাবলাম, কাল থেকে বউদির সঙ্গে আর একটু ভালো ব্যবহার করতে হবে। বড্ড যেন অগ্রাহ্য করি। ওর আবিষ্কৃত মঠটাকে দখল করে নিয়ে আমি ওকে অবজ্ঞার চোখে দেখি। এটা ঠিক নয়, এটা অসভ্যতা।

তারপর বউদির মান রাখতেই যেন বউদির বড়ো আয়নাদার ড্রেসিং-টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

সাতাশ

কিন্তু এ কী!

কতদিন পরে নিজেকে দেখলাম আমি!

এ কী হতশ্রী চেহারা হয়েছে আমার!

আমার মঠের দিদিরা আমায় বলে, 'কী রূপ!'

আমি সে প্রশস্তি পরিপাক করি।

আমার গুরুদেব বলেন, 'মা আমার পূর্বজন্মে ব্রজের গোপিকা ছিল।' আমি নতমুখে সে গৌরব গ্রহণ করি, আর বড়ো আরশীতে না দেখলেও নিজে মনে ভাবি আমি আমার এই কৃচ্ছ্রসাধনের জ্যোতিঃপ্রলেপমণ্ডিত কৃশতনুতে, এই তৈলবিহীন রুক্ষ চুলে ঘেরা মুখে, সত্যই অপরূপা।

আর এ-কথাও ভাবতে ছাড়ি না, মঠে আমার প্রাধান্যের মূলে হয়তো এই রূপও কিছু কাজ করে।

কিন্তু আজ এই এক দাম্পত্যজীবনের বহু চিহ্নমণ্ডিত ঘরের যুগলশয্যায় স্তূপীকৃত করা শাড়ির পাহাড়ের চোখ-ধাঁধানো বর্ণবৈচিত্র্যের মাঝখানে বড়ো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের খালি হাত আর সরু হলদে পাড় ধুতি পরা হতশ্রী চেহারাটা এনে আমার দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গহাসি হাসল।

যেন দুয়ো দিল আমায়।

যেন বলে উঠল, 'কী মুখ্যু, কী মুখ্যু! মশা মারতে কামান দেগেছে!'

সেই ব্যঙ্গহাসির দিকে তাকিয়ে আমি সহসা হিংস্র হয়ে উঠলাম। উগ্র হয়ে উঠলাম। আমি বউদির সাজসজ্জার সমস্ত উপকরণ নিয়ে নিখুঁত করে সাজালাম নিজেকে।

আশ্চর্য, কিছুই তো ভুলে যাইনি।

কাজল পরলাম সরু রেখায়, কুঙ্কুমের টিপটি আঁকলাম সযত্নে, কানে দোলালাম মুক্তোর কানবালা, গলায় সরু মুক্তোর হার।

হিংস্র জবাবের মনোভাব থেকে কখন যেন শোকাচ্ছন্নের মতো অবস্থা ঘটল। মোহাবিষ্টের মতো তাকিয়ে রইলাম নিজের প্রতিচ্ছায়ার দিকে।

মনে হল বিয়ের সাজ সাজছি আমি।

জানলা দিয়ে এসে পড়া পড়ন্ত সূর্যের 'কনে দেখা আলো' সেই ভাবনাকে আরও মধুর করে তুলল।

কতক্ষণ তাকিয়ে ছিলাম জানি না, দাদা ঘরে ঢুকল অফিস থেকে এসে। কোমল স্নেহের গলায় বলল, 'নেমন্তন্নে যাচ্ছিস? বন্ধুর ছেলের ভাতে? পৌঁছে দিয়ে আসব?'

তার মানে দাদা ঘরে ঢোকবার আগেই খবর শুনেছে। আর দাদার মনটা খুশি হয়েছে সে খবরে। দাদার স্নেহের সুরটাই সেই খুশির সাক্ষী।

কিন্তু আমার এ কী হল?

আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত বয়ে যাওয়া এক দুর্দান্ত লজ্জার ধাক্কা যেন বিদ্যুতের শক-এর মতো ধাক্কা মেরে ছিটকে সরিয়ে দিল আমায় আয়নার কাছ থেকে। ভয়ঙ্কর রাগ হল দাদার উপর, ভয়ঙ্কর রাগ হল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর। সারা শরীরের মধ্যে ধ্বনিত হল, ছি ছি ছি! এ আমি কী করেছি!

আটাশ

কেমন করে যে ছিটকে সে ঘরের থেকে চলে এসেছিলাম তা জানি না, কেমন করে যে সেই শাড়ি-গহনাগুলোর ভারমুক্ত হয়েছিলাম, তাও জানি না। শুধু মনে আছে খুব হাঁপাচ্ছিলাম।

এই সময় বুড়ি, গোপালের মা এসে দরজায় দাঁড়াল, 'দিদি, তোমার গাড়ি এয়েছে।'

গাড়ি এসেছে!

কোথাকার গাড়ি?

শিপ্রার পাঠানো?

আরে না না, মঠের গাড়ি। হরিচরণ এনেছে। কনে দেখা আলো মুছে সন্ধ্যার ছায়া পড়ে গেছে যে। আরতির সময় হয়েছে।

কৃতজ্ঞতায় মনে মনে দেয়ালে মাথা কুটে বললাম, 'ঠাকুর, তুমি আছ, তুমি আছ।' তারপর স্নানের ঘরে ঢুকে ধুয়ে ফেললাম মুখের সব রং, মুছে ফেললাম চোখের কাজল, কপালের টিপ। আলনা থেকে নিজের দুধ-সাদা শাড়ি-ব্লাউজটা পরে ছুটে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে গেলাম, 'ভীষণ ভুলে গিয়েছিলাম বউদি! আজ যে মঠে একটা বিশেষ উৎসব। শিপ্রার বাড়ি থেকে কেউ নিতে এলে বলে দিও।...তোমার শাড়ি-টাড়িগুলো অগোছালো করে রেখে গেলাম বাপু—'

বউদির সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবার সঙ্কল্পটা পালন করলাম। 'বউদি' বলে ডাকলাম, অনেকগুলো কথা বললাম।

কিন্তু বউদি কি বুঝল আমি ভালো ব্যবহার করেছি? নাকি সেও ছি ছি করে উঠে নিশ্বাস ফেলল।

জানি না কী করল।

আমি তো গাড়িতে উঠে নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

যেমন নিশ্বাস ফেলে লোকে আততায়ীর হাত থেকে উদ্ধার হয়ে নিজের এলাকায় পৌঁছে যেতে পারলে।

কিন্তু আততায়ী কে?

তাও জানি না। ভেবে দেখবারও সময় নেই, আরতির সময় পার হয়। হরিচরণ পড়ি মরি করে

গাড়ি চালাচ্ছে। মঠের ব্যাপার, ঘড়ির কাঁটায় চলে। মুখের রং তুলতে যেটুকু দেরি করে ফেলেছি আমি, তাতেই দেরি।

তবু দেরি হল না, ঠিক সময় এসে পা দিলাম মঠের চৌহদ্দিতে, মালঞ্চ আর তুলসীবনের কেয়ারির মাঝখানের পথ দিয়ে যখন নাটমন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালাম, তখন আরতির ওয়ার্নিং বেল বাজছে। ঢং ঢং ঢং।

যে যেখানে ছড়িয়ে আছে, এসে স্থির হয়ে বসবে, তাই এই জানান।

আমি নাট-মন্দিরে উঠলাম না, অভ্যস্ত নিয়মে চত্বরের পাশ দিয়ে চলে গেলাম বিগ্রহের ঘরের পিছনে। ভক্তপদধূলি মাথায় ঠেকিয়ে সিঁড়িতে পা দিলাম। উঠে গিয়ে মন্দির প্রদক্ষিণ করে বিগ্রহের সামনে এসে দাঁড়ালাম।

দাঁড়ালাম যেখানে শঙ্কর মহারাজও দাঁড়িয়ে আছেন জীবন্ত বিগ্রহের মতো। সেই দীর্ঘোন্নত গৌরকান্তি, সেই গায়ের রঙে এক হয়ে যাওয়া দুধে-গরদের ধুতি-চাদর, সেই আজানুলম্বিত গোড়েমালা, সেই শুভ্র ললাটে ইন্দু সমান চন্দনচর্চা। মাথা নুইয়ে এল।

সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করলাম।

এই প্রথম এই প্রণাম।

আমি কখনও আমার ওই মঠের দিদিদের কিংবা ব্রহ্মচারী দাদাদের মতো সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি না, ওটা দেখলে আমার হাসি পায়, সেকেলে লাগে, অতিভক্তি মনে হয়। আমার প্রণামের ভঙ্গি নতজানু হয়ে আস্তে চরণে মাথা ঠেকানো। চরণে মানে চরণের প্রান্তে। চরণ স্পর্শ করা নিষেধ।

কিন্তু আজ আমি 'সেকেলের' মতো লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে মাথার মধ্যে দিয়ে যেন একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ বহে গেল। লজ্জার নয়, আনন্দের।

গুরুদেব আজ ইচ্ছে করে নিয়ম ভাঙলেন, স্পর্শ দিলেন মাথায়। তার মানে বুঝতে পেরেছেন আমার চাঞ্চল্য। তাই তাকে প্রশমিত করতে—

কী দয়া, কী করুণা!

ভাগ্য আমার জন্যে এত ঐশ্বর্যও তুলে রেখেছিল!

আরতি অন্তে হরিরলুঠের কাড়াকাড়ির সময় গুরুদেব নিজে আমার হাত টেনে নিয়ে একটি সন্দেশ তুলে দিলেন, বললেন, 'মায়ের মনে আজ বড়ো চাঞ্চল্য, তাই না? বড়ো ভয় পেয়েছিস?'

আমি অবাক হয়ে তাকালাম। সত্যিই কি অন্তর্যামী?

নইলে কেমন করে জানলেন, ভয় পেয়েছি! আগে হলে হয়তো ভাবতাম, বুঝতে পারবেন না কেন, মানুষ চরানোই তো পেশা। হয়তো ভাবতাম, গুরু হবার আগে থট্‌রিডিংটা শিখে নিতে হয় বোধহয়।...কিন্তু আজ আর সে কথা মনে এল না। আজ আমি অবাক হলাম, বিহ্বল হলাম। তার মানে খোলসের চাপে আমার সত্তাটা তরলিত হয়ে যাচ্ছে।...ছদ্মনামের আড়ালে আমার সত্যিকার নামটা ঢেকে যাচ্ছে। আর তাতে আমি প্রতিবাদ করে উঠছি না, বরং যেন একটা নিশ্চিন্ততা বোধ করছি।

আচ্ছা, আজও কি রাত্রে বিনিদ্র শয্যায় শুয়ে ভাবব, 'লোকটা জাদু জানে?' ভাবব, 'আমাকে কবলিত করবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছে কেন ও?'

কিন্তু বিনিদ্র শয্যায় শুয়ে চিন্তায় ক্ষতবিক্ষত কি হই আজকাল? রাত্রে কি পায়চারি করি? স্নানের ঘরে গিয়ে শাওয়ারের তলায় মাথা পাতি?

কই, মনে পড়ছে না তো?

কবে শেষ এ রকম করেছিলাম?

ভুলে গেছি।

আজকাল বহুক্ষণ কীর্তনের সঙ্গে গলা মিলিয়ে মিলিয়ে দোহার দিতে, আর কীর্তন গান গাইতে

এত পরিশ্রম হয় যে, রাতে যে-পাশে শুই, সকালে সেই পাশে উঠি। তার মানে খোলসটা ক্রমশ এঁটে বসছে। আমি সেটা রোধ করতে পারছি না। আমি যেন দর্শকের ভূমিকায় অভিনয় করছি।

উনত্রিশ

পরদিন কিন্তু ভয়ানক একটা গ্লানি নিয়ে উঠলাম। মনে হল দাদা-বউদির কাছে আমি আর মুখ দেখাতে পারব না। বাস্তবিক কী হাস্যকর কাণ্ডই করলাম কাল! কী দরকার পড়েছিল সাজবার, আর সাজ ঘোচাবার?

হঠাৎ হরিচরণের উপরও রাগ হল। ও যদি ঠিক সেই মুহূর্তে এসে হাজির না হত! আমাকে নিয়ে যেন কে কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

বিকেলবেলা শিপ্রা এল।

বলল, 'জানতাম আসবে না।'

'জানতে?'

'তা ছাড়া কি? আমার ছেলের কি এত ভাগ্যি হবে?'

'এই ছিঃ, তোমার ছেলেকে দেখে আসব একদিন।'

'দেখা যাক কবে সাতমণ তেল পোড়ে।'

কথার পালা শেষ করে ও কাজের কথায় এল। বলল, 'এই দেখ কাণ্ড কি এসেছে। ভাবলাম তুমি আসবে, তোমরা হাতেই দেব। তা এলেই না।'

তারপর ব্যাগ থেকে চিঠি বার করল।

দুরন্তর চিঠি।

লিখেছে—

'ভয়ঙ্কর একটা সুখবর দিচ্ছি নাও। কিন্তু খবরদার শুনে যেন আহ্লাদে হার্টফেল করে বোসো না। শুধু বিগলিত হও, উল্লসিত হও। শোনো, আমার ওপরওলার সঙ্গে সাংঘাতিক রকম ভাব করে ফেলে একদিন আমার জীবনের সব কথা বলে বসেছিলাম, তার ফলে সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার দু'মাস ছুটি মঞ্জুর করেছে বিয়ে করে ফেলবার জন্যে। আবার তার সঙ্গে যাতায়াতের খরচা। ভাবতে পারো? অবশ্য ওটা একা আমার।...নিকষ কালো মুখে দুষ্টু দুষ্টু হেসে বলল—ফেরার সময় তোমার খরচা আছে। বউকে নিয়ে আসবে। ওটা কিন্তু কোম্পানি দেবে না। তবে ফিরে এসে আলাদা বাড়ি পাবে।... ভারি ভালো লোক! তাছাড়া—আমার কাজে এত বেশি সন্তুষ্ট যে নিয়ম ভেঙে সুযোগ দিচ্ছে। আমার দলের আর সবাই আমার সৌভাগ্যে ঈর্ষিত। এর পর আবার যখন একটি সুন্দরী স্ত্রী নিয়ে ফিরব, রাগে বোধহয় আমার মুখ দেখবে না।'

তারপর টাকাকড়ি, এখানের ব্যাঙ্ক ওখানের ব্যাঙ্ক, তার নিয়মকানুন, কত কি যেন লিখে শেষকালে লিখেছে, 'একমাস পরেই রওনা দিচ্ছি। তার আগে তোমায় আমার এখনকার একটা ফটো পাঠাব, যাতে দেখে সহজে চিনতে পার। কে জানে যদি বদলেই গিয়ে থাকি।...এই একমাস বোধহয় রাত্রে ঘুমোতে পারব না, কারণ এখন থেকেই যা রোমাঞ্চ হচ্ছে।...এখানে এসে তোমার নিশ্চয়ই খুব ভালো লাগবে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের তুলনা নেই। আগে ভয় ভয় করত, এখন সাংঘাতিক ভাবে এই বন্য সৌন্দর্যের প্রেমে পড়ে গেছি। দেখ, তোমাকেও পড়তে হবে প্রেমে।...আরে না না, তুমি শুধু আমার প্রেমে ডুবে থেকো।

ইতি

তোমার শ্রীদুরন্ত।'

কতদিন ধরে কোনো অজানিত দেশে পড়ে আছে দুরন্ত, কেমন তার কাজ, কেমন সহকর্মীরা, কেমনই বা প্রভু, কী তাদের ভাষা, কী আচার-আচরণ, তবু ওর চিঠির ভাষা বদলায়নি। যে ভাষাটা ঠিক ওর মুখের ভাষারই মতো। কারণে অকারণে 'ভয়ঙ্কর,' 'সাংঘাতিক', 'অদ্ভুত,' 'অপূর্ব'।

ভাষা বদলায়নি, তার মানে স্বভাব বদলায়নি।

অথচ আমি আমার নিজের কেন্দ্রে থেকেও ভয়ঙ্করভাবে বদলে যাচ্ছি।

কিন্তু আমি কি আমার কেন্দ্রে আছি?

শিপ্রা ক্ষুণ্ণ হয়ে চলে গেল।

কারণ শিপ্রা বুঝে গেল আমার সেই বদলটা। এতদিন ধরে ও আশা করেছিল, প্রয়োজন ফুরোলেই আমি আমার এই মিথ্যাচরণ ভেঙে ফেলে প্রকাশিত হব, কারণ ওকে আমি ষড়যন্ত্রের সাক্ষী রেখেছিলাম। ও বলেছিল, 'তোর বিয়ের দিন আমি তোকে সাজাব।' বলেছিল, 'শবরীর প্রতীক্ষার আর-এক ইতিহাস সৃষ্টি করছিস তুই।'

কিন্তু আজ বুঝতে পেরে গেল আমার জগৎ আর ওর জগৎ ভিন্ন হয়ে গেছে। বুঝতে পারল, ভয়ঙ্কর সুখবরবাহী ওই চিঠিটা আমাকে আর এখন উল্লসিত করে তুলতে পারল না। খুব ভালো করে পড়লামও না আমি।

ত্রিশ

নাঃ, সত্যিই ভালো করে পড়তে পারিনি।

ওর সুখবরটা হঠাৎ যেন আমার বুকে হাতুড়ির ঘা বসিয়ে দিয়েছিল। মনে হল যেন একখানা লোভের হাত এগিয়ে আসতে চাইছে আমার শান্তির বাসা ভেঙে দিতে।

মনে হল সে হাত অশুচি।

তবে? আমি কেন এগোতে দেব সে হাত?

আমি আমার নিভৃত শান্তি, আমার শুভ্র পবিত্রতা কলুষিত করতে দেব কেন?

কে ও?

আমার একদার মাস্টারমশায়ের আশ্রিত একটা বন্য বর্বর বাজে ছেলে। লেখাপড়া ছেড়ে টাকা টাকা করে ছুটে গিয়েছে আফ্রিকার জঙ্গলে। কে জানে কী খাচ্ছে কী না-খাচ্ছে, কী অপবিত্রতার মধ্যে জীবন যাপন করছে, ওর ওই লোভের হাতে নিজেকে সমর্পণ করব আমি?

ছিঃ! কেন?

এক সময় একটু ছেলেমানুষী ভালোবাসার খেলা খেলেছিলাম বলে? সেই দাবিতে ও আমায় টেনে নিয়ে যাবে আরও বর্বরতার মধ্যে?

না না, অসম্ভব।

ওর সঙ্গে আর আমার জীবনের ছন্দ মিলবে না।

আমার জীবনের ছন্দ শান্ত স্নিগ্ধ শুদ্ধ।

কিন্তু পুজো করতে বসে মন বসাতে পারছি না কেন?

বারে বারে ওই দেবমূর্তির জায়গায় একটা অশান্ত অস্থির-মূর্তির ছায়া পড়ছে কেন? ভয়ঙ্কর একটা যন্ত্রণা বোধ করছি কেন? এ কি অশুচি চিন্তার গ্লানির যন্ত্রণা? না খোলস ভেঙে পড়বার আকুতি?

আমি বুঝতে পারছি না।

আমার ভয় করছে।

মনে হচ্ছে ওই প্রবল হাত আমায় এই শান্তির ছন্দের মধ্যে থাকতে দেবে না। টেনে নিয়ে যাবে, লুঠ করে নেবে।

নিক তবে, সর্বস্ব নিক আমার।

নিজের তৈরি যে জালে আটকে পড়ে ছটফট করছি আমি, সে জাল থেকে উদ্ধার করুক আমায় ছিঁড়ে খুঁড়ে তচ্‌নচ্‌ করে।

লজ্জা করবে?

কই, শানুর তো লজ্জা করল না?

শানু তো মুছে-ফেলা সিঁথিতে আবার সিঁদুর তুলেছে। তবে আমার এই কুমারী সিঁথির শুভ্রতা রক্তিম করে তুলতে লজ্জা কি? সেই রক্তিম সিঁথি নিয়ে আমি তো হাততালি দিয়ে বলতে পারব সবাইকে—দেখ, এতদিন কেমন ঠকিয়ে এসেছি তোমাদের! এই অভিনয়টি না করলে তোমরা আমায় প্রতীক্ষার স্বস্তি নিয়ে টিকতে দিতে কি?

আচ্ছা, কাল থেকেই কি তবে সেই হাততালিটা দিতে আরম্ভ করব আমি? সকালে উঠে সবাইকে দেখাব এই চিঠিটা? তারপর বলব—

একত্রিশ

নাঃ, বলিনি সকালে উঠে।

আগে আসুক ও।

কে বলতে পারে হঠাৎ ওই ছুটিটা না-মঞ্জুর হয়ে যাবে কি না।

যেমন চলছে তেমনিই চলুক তবে।

এই আমাদের পুজো-জপ-ভোগ-আরতি-কীর্তনের ফুল দিয়ে মালা গাঁথা।

হ্যাঁ, এক-একটি দিনকে এক-একগাছি ফুলের মালার মতোই লাগে আমার।

যোগ হতে থাকে মালার সঙ্গে মালার, যেমন যোগ হয় জপের সঙ্গে জপের।

তার সঙ্গে দিন গুনছি কবে ওর ছবি আসবে।

কিন্তু ছবি এল না।

ছবির আগে নিজেই চলে এল।

ও সমুদ্রের ভেসে এল না, আকাশে উড়ে উড়ে এল।

বত্রিশ

তখন কনে দেখা আলো ঝিকমিক করছে, আমি স্নান সেরে কপালে চন্দনসাজ করে নিরাভরণ নির্মল দেহে আমার সেই দুধ-সাদা মিহি শাড়ি-ব্লাউজ পরে অপেক্ষা করছি হরিচরণের গাড়ির শব্দের হঠাৎ দাদা এসে ঘরে ঢুকল।

একটু যেন উত্তেজিত, একটু যেন বিস্মিত।

'দেবী, দেখো তো কে একজন এসে দেখা করতে চাইছে তোমার সঙ্গে—'

দাদা কোনো নাম করেনি, তবু আমি বুঝতে পারলাম, আমার সমস্ত শরীর হঠাৎ হিম হয়ে গেল। আমি কিছু বলতে পারলাম না, শুধু তাকিয়ে রইলাম দাদার দিকে।

দাদা নিজেকে একটু সামলে নিল, বলল, খুব সম্ভব তোমার কোনো গুরুভাই-টাই হবে। বলছে পশ্চিম আফ্রিকায় ছিল অনেক দিন। তুমি নাকি জানো আসবে। জাহাজে আসার কথা ছিল, হঠাৎ প্লেনে সিট পেয়ে—'

দাদা নিজেকে সামলাল, আমি বেসামাল হলাম। আমি থরথরিয়ে উঠলাম। তাই কী বলব বুঝতে না পেরেই বুঝি উত্তেজিত গলায় বলে উঠলাম, 'পাগল নাকি!'

'কী? তুমি চেনো না?'

'কক্ষনো না।'

'কী আশ্চর্য! তবে কি কোনো বদলোক—' দাদা বলল, 'কিন্তু দেখলে তো—'

আমি স্থির গলায় বললাম, 'হয়তো বাড়ি ভুল করেছে।'

'কিন্তু তোমার নাম-টাম বলল—একবার দেখবে নাকি?'

'কোনো মানে হয় না দেখা করবার।'

বললাম আমি স্পষ্ট স্থির গলায়।

কোনো মানে হয় না দেখা করবার।

কারণ আমি তখনই সেটা স্পষ্ট টের পেলাম, কোনো মানে হয় না দেখা করবার। দাদা আরও কি বলতে যাচ্ছিল, হরিচরণের গাড়ির আওয়াজ পেলাম। পরিচিত হর্ন।

আমি বললাম, 'আমি যাচ্ছি। বাড়ি ভুল করেছে সেটাই বুঝিয়ে দাও গে।'

হয়তো সেটা বুঝিয়ে দেওয়া দাদার পক্ষে শক্ত হত, হয়তো ও কিছুতেই বুঝতে চাইত না। কিন্তু ওর ভাগ্যই ওকে বুঝিয়ে দিল, নিঃশব্দে সহজে, যে ভাগ্য ওকে বসবার ঘরে বসিয়ে না রেখে ফুটপাতে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল।

হয়তো গাড়িটাকে আসতে দেখেই ও ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল, হয়তো শুধু শুধুই। স্থির থাকতে পারছি না বলে।

আমি ওর সামনে দিয়ে এগিয়ে এসে গাড়িতে উঠলাম। আমার কানে এক টুকরো গরম সীসে এসে ঢুকল। কিন্তু সেটা আমি কানে রাখব কেন? ও তো 'দেবী' বলল না, বলল 'বেবি'।

যে নাম সবাই ভুলে গেছে, আমি নিজেও ভুলে গেছি।

আমি দেবী। দেবী মা। মঠ থেকে নিয়মিত আমার জন্যে গাড়ি আসে, কারণ আমি সুরে সুর না মেলালে কীর্তনে প্রাণসঞ্চার হয় না। এর বেশি আর কি চাইবার থাকতে পারে জীবনে?

তেত্রিশ

আজ আর দেরি হয়নি।

হরিচরণ আস্তে আস্তে গাড়ি চালাচ্ছে। আমি নিজেকে ছেড়ে দিয়ে আরামদায়ক সিটে পিঠ ঠেকিয়ে বসে আছি। আর আমার ভয় নেই, কারণ আমি কুমিরের হাঁ থেকে পালিয়ে আসতে পেরেছি।

এখন আমি শান্ত আর আত্মস্থ মহিমায় মঠের চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকে মালঞ্চ আর তুলসীবনের মাঝখানের কেয়ারি-করা পথটি ধরে নাট-মন্দিরের বাঁধানো চত্বরের পাশ দিয়ে অভ্যস্ত অধিকারের ভঙ্গিতে এগিয়ে যাব বিগ্রহের ঘরের পিছনে, সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাব বারান্দায়, মন্দির প্রদক্ষিণ করে এসে দাঁড়াব বিগ্রহের সামনে, যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন আর এক জীবন্ত বিগ্রহ। যার পরনে গায়ের রঙের সঙ্গে মিশে যাওয়া রঙের দুধে-গরদের ধুতি-চাদর, যে চাদর খসে খসে পড়ে বার বার উদ্ভাসিত করে তোলে দীর্ঘোন্নত সুগঠিত দেহদ্যুতি। কপালে তাঁর চন্দনলেখা, গলায় আজানুলম্বিত গোড়েমালা, মুখে অলৌকিক করুণার হাসি।

এ আশ্রয় ছেড়ে কোথায় যাব আমি? এর চেয়ে পরম পাওয়া আর কি আছে?

—ঃ ঃ—